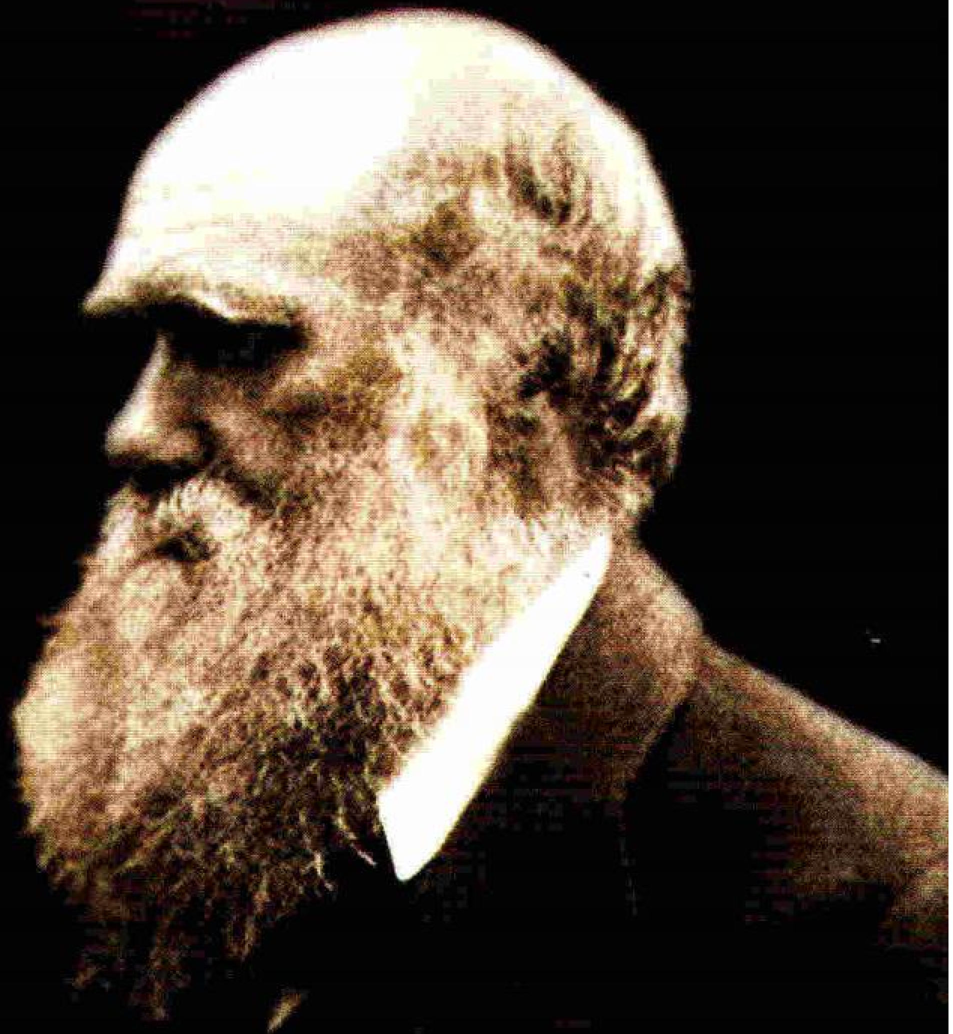
চার্ল্‌স্‌ ডারউইন
ও
প্রজাতির উৎপত্তি

দ্বিজেন শর্মা



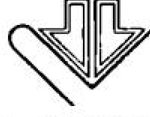
চার্ল্‌স্ ডারউইনের বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছে জগৎকে। এই যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ধারণা মানুষের ভাবজগতে তৈরি করেছে প্রলয়। নানা সামাজিক কারণে ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে অস্বস্তিরও অন্ত নেই। কিন্তু অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ থাকে না। এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর জীবন ও সমকালীন বিজ্ঞানজগতের ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভাবনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন দ্বিজেন শর্মা। সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে তিনি বিবর্তন-ভাবনার ইতিহাস ও বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সেই সঙ্গে হাজির করেছেন প্রজাতির প্রকারভেদ বিষয়ক তথ্য এবং বিবর্তনের বাস্তব বিভিন্ন উদাহরণ। সুললিত ভাষায় প্রজাতির বিবর্তনের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে এখানে। বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা ও পরিবেশ-ভাবনায় নিবেদিত দ্বিজেন শর্মা সাহিত্যচেতনা ও বিজ্ঞানদৃষ্টির মিশেলে এক অনুপম গ্রন্থ আমাদের উপহার দিলেন। আকারে ছোট হলেও তাৎপর্যে তা বিশাল।

ISBN 984-70124-0037-1

চার্ল্‌স্‌ ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি

দ্বিজেন শর্মা

সাহিত্য প্রকাশ



প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
তৃতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৩, সেপ্টেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৪১৫, মার্চ ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০৪, জুলাই ১৯৯৭
ISBN 984-70124-0037-1

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

নটেরডাম কলেজের ছাত্র
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দুই শহীদ
লেফটেন্যান্ট আশফাকুস সামাদ
মোহাম্মদ নাসিম মোহসীন

কাউকে ভুলি নি, কিছুই ভুলব না

লেখকের অন্যান্য বই

শ্যামলী নিসর্গ
ফুলগুলি যেন কথা
উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্ব
জীবনের শেষ নেই
সতীর্থবলয়ে ডারউইন
স্বদেশে প্রবাসে
গহন কোন বনের ধারে
মম দুঃখের সাধন

প্রাক্-কথন

বইটি কিশোরপাঠ্য হওয়ার কথা ছিলো এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই লিখতে শুরু করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাটি বাতিল করতে হয়, কেননা, মনে হয়েছে, ডারউইনের জীবনী যদিও-বা কিশোরপাঠ্য হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব কোনোভাবেই নয়। সোজা কথায় ডারউইন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মতবাদ প্রকট বস্তুবাদী। এমন ধারণা কিশোর মনে দৃঢ়বদ্ধ করা অনুচিত। তাই তার চাইতে বেশি বয়সী তরুণদের অর্থাৎ যারা কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী, তাদের জন্যই বইটি লিখলাম। ডারউইনের জীববিবর্তনবাদ থেকে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এড়ানো বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন, তবু তার চেষ্টা করেছি, যদিও এই সত্য এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বিজ্ঞানের দর্শনের সামনে ধর্মকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো নিরর্থক। ডারউইনের সমসাময়িক প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীই ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী, আস্তিক এবং তাঁরা এই বলে ডারউইনবাদ গ্রহণ করেন যে, ঈশ্বর প্রাণের আদিস্রষ্টা আর বিবর্তন ঘটেছে তাঁরই নির্দেশে, সুতরাং একে স্বীকৃতিদানে ধর্মচ্যুতির আশঙ্কা অমূলক। অন্যথা ডারউইনের শিক্ষক হেনশ্লো এবং বন্ধু লায়েল ও হুকার কখনোই তাঁর তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক হতেন না।

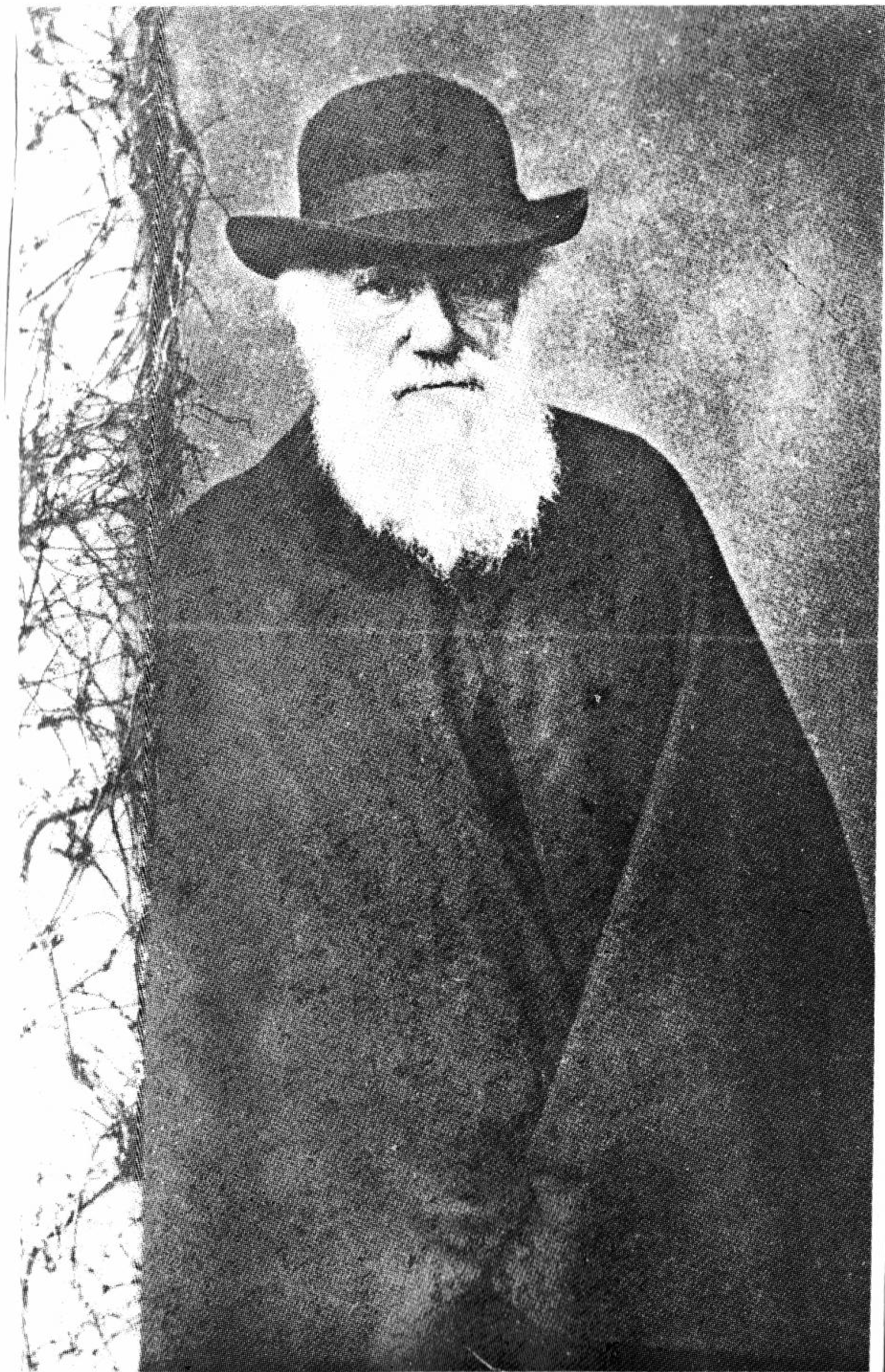
ডারউইন শুধু বিজ্ঞানী নন, দার্শনিক তথা বিপ্লবীও। যাঁরা তার Origin of Species গ্রন্থের শেষোক্ত তাৎপর্যগুলো সবার আগে উপলব্ধি করেছিলেন, কার্ল মার্ক্স্ তাঁদের অগ্রগণ্য। নিজের বিশ্ববীক্ষা গড়ে তোলার জন্য জীবজগতের উদ্ভব ও বিকাশের অত্যন্ত জরুরি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তিনি বিবর্তনবাদেই খুঁজে পান। তাই মার্ক্স্ তাঁর Capital অর্থাৎ 'পুঁজি' গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চান। অস্বস্তিপীড়িত ডারউইন রাজি হন নি। Origin of Species প্রকাশের পর ১৩৬ বছর পেরিয়ে গেছে, তবু ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদের আক্রমণ আজো অব্যাহত। মার্ক্স্ ও ডারউইন উভয়ই তাদের চক্ষুশূল।

ডারউইনবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলেও ব্যাপক বিভ্রান্তি প্রচলিত, বলা বাহুল্য যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এঁদের অনেকেই বলেন, বর্তমান গবেষণার ফলে নাকি তত্ত্বটি ভ্রান্ত প্রমাণিত ও বর্জিত হয়েছে। এটা একটা ডাহা মিথ্যা। প্রসঙ্গত ডারউইনের একটি উক্তি উল্লেখ করার মতো। ১৮৬৯ সালে তিনি হুকারকে লিখেছিলেন : 'আরো বিশ বছর বেঁচে থাকলে, কর্মক্ষম থাকলে origin কতটা যে বদলাবে, প্রতিটি বিষয়ে আমার মতামত কতটা যে পালটাবে, কে জানে, আসলে সবে তো শুরু।' হ্যাঁ শুরু বৈকি এবং তাতেই কেঁপে উঠেছিলো গোটা বিশ্ব আর সেই কাঁপুনি থামে নি আজো। যে-কোনো মৌলিক বিজ্ঞানতত্ত্বের মতোই ডারউইনবাদও ক্রমাগত সংশোধিত ও

শুদ্ধতর হয়েছে এবং এখন দাঁড়িয়েছে সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তির ওপর।

বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী ও প্রাজ্ঞ প্রকাশক মফিদুল হকের অবিরাম তাগাদাই এই গ্রন্থ রচনার নেপথ্য-প্রেরণা, তাতে অণুমাত্রও অতিশয়োক্তি নেই। Origin of Species ছাড়াও দু'টি বই থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। বই দুটি হলো : Charles Darwin : A Great Life in Brief (Alfred A. Knopf, New York, 1966) ও Darwinism Defended, Michael Ruse (Addison-Wesley Publishing Co. Reading, Massachusetts, 1982)। শেষোক্ত অতি মূল্যবান এই বইটি পাঠিয়েছেন মানচেস্টার প্রবাসী চিরবান্ধব সইফুদ্দিন আহমদ, যাঁর অকৃপণ ঔদার্যে আমার ডারউইন বিষয়ক গ্রন্থভাণ্ডার আজ সুসমৃদ্ধ। ছবি তোলায় সাহায্য করেছেন ড. বিজন সাহা। তিনি মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাস বিদ্যালয়ে বর্তমানে আমার সহকর্মী। তাঁকে ধন্যবাদ।

মস্কো, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ **দ্বিজেন শর্মা**



চার্ল্‌স্‌ ডারউইন

রুশ বিজ্ঞানী ক্লিমেন্ত তিমিরিয়াজেভ ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী চার্ল্‌স্‌ ডারউইনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে বিজ্ঞানীর আবাস ডাউনগাঁয়ে যাওয়ার জন্য লন্ডনের অদূরস্থ অফিংটন স্টেশনে এসে নামেন। নামার পর গন্তব্যে পৌঁছার জন্য কোনো যানবাহন খুঁজে তিনি পান নি। আজ শতাধিক বছর পর একই উদ্দেশ্যে ওই স্টেশনে নামলে আজও কোনো সাধারণ যানবাহনের সাহায্য কেউ পাবেন না। হিচহাইকিংয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হলে অগত্যা তিমিরিয়াজেভের মতো দশ মাইল পথ হাঁটতেই হবে। কেন্টের অপূর্ব নিসর্গদৃশ্য দেখে দেখে, ওই মহাবিজ্ঞানীর পদরেখা ধরে হেঁটে হেঁটে নানা কথা ভেবে ভেবে অচিরেই পৌঁছে যাওয়া যায় ডাউনগাঁয়ে। অতঃপর ডারউইন-ভবন খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধা মেলে না। যাঁর জন্য গ্রামটি বিশ্বখ্যাত তাঁর আবাসটি যে-কোনো গ্রামবাসী সাগ্রহে দেখিয়ে দেয়। ছায়াঘন আঁকাবাঁকা এক দীর্ঘ পথের প্রান্তে এক সময় একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। সাইনবোর্ড ও দু'একজন অতিথি-অভ্যাগত দেখে গৃহ-জাদুঘরটি শনাক্তও করা যায়, কিন্তু যা অবাক করে তা হলো ডারউইন-ভবনের শাদামাটা গ্রামীণ পরিবেশ। কীভাবে এখানে, শহর থেকে দূরের এই নির্জনে একজন মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের মতো পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়ে দুনিয়া-কাঁপানো একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন সম্ভব হলো? সম্ভব বৈকি। গ্যালিলিও বা নিউটনের পরিবেশ কি তেমন জমকালো ছিলো? মোটেই না। স্মর্তব্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের জন্য যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে বিজ্ঞানী মানুষটি সত্যিকার বিজ্ঞানী না হলে সবই বৃথা। ডারউইন সেই সত্যিকার বিজ্ঞানীদেরই একজন। প্রতিভার সঙ্গে অধ্যবসায় ও অনুকূল পরিস্থিতির মেলবন্ধন ঘটলেই কেবল অসাধ্যসাধন সম্ভব।

ডাউন কিন্তু ডারউইনের জন্মস্থান নয়। পৈতৃক ভবনটি তাঁর এখান থেকে অনেকটা দূরে, ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রুস্‌বেরি শহরে। সেভার্ন্‌ নদীর তীরের ওই

মফস্বল শহরে চার্লস্ ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। পিতা রবার্ট ডারউইন নামি চিকিৎসক। আর পিতামহ এরেসমাস ডারউইনও চিকিৎসক, তদুপরি বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি হিসেবেও স্বনামখ্যাত। বিশ্ববন্দিত ফরাসি বিবর্তনবিদ লামার্কের সমসাময়িক এরেসমাসও জীবজগতের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। চার্লস্ ডারউইন কৈশোরেই পিতামহের ওই গ্রন্থ *Zoonomia* পাঠ করেন। পরে এডিনবরায় ড. গ্রান্ট নামের জনৈক প্রাণিবিদের কাছে লামার্কবাদের বয়ান শুনে পিতামহের তত্ত্বের কথা মনে পড়ে এবং বইটি দ্বিতীয়বার পড়েন। তাঁর ভাষায়, "দশ-পনেরো বছর ফারাকের পর বইটি আবার পড়ে খুবই নিরাশ হই। উল্লিখিত তথ্যের তুলনায় তাতে অনুমানের মাত্রা ছিলো খুবই বেশি।"

মা সুজানা যখন ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ মারা যান, ডারউইনের বয়স তখন সবে আট বছর পেরিয়েছে। পরে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "তাঁর মৃত্যুশয্যা, কালো ভেলভেট গাউন, অদ্ভুত গড়নের কাজের টেবিল ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না।" সেই বছর বসন্তেই বাড়ির লাগোয়া একটি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনায় মোটেই মন বসতো না। মাতৃহীন কিশোর শ্রুস্‌বেরির মাঠেঘাটে, বনবাদাড়ে, সেভার্ন্ নদীর তীরে দিনমান ঘুরে বেড়াতেন। সম্ভবত দাদামশায়ের স্বভাবের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন, তাই ছেলেবেলায়ই বাঁধা পড়েন প্রকৃতিপ্রেমের মায়াজালে। অনেক গাছপালার লাতিন নাম জানতেন, খুঁজে বেড়াতেন যতো রাজ্যের পোকামাকড়, ঝিনুক-শামুকের খোল আর পাখির ডিম।

পুত্রের পড়াশোনায় সুস্পষ্ট অমনোযোগ এবং মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানোর বাড়াবাড়ি দেখে চিন্তিত পিতা তাকে পরের বছর পাঠান শহরের বোর্ডিং স্কুলে। কড়া শাসনের জন্য পরিচিত ড. বাটলারের স্কুলে ডারউইন কাটান দীর্ঘ সাত সাতটি বছর। সেই যুগে এইসব স্কুলে ভূগোল, ইতিহাস, লাতিন ভাষা ও ব্যাকরণ ছাড়া আর কিছুই পড়ানো হতো না। বিজ্ঞান বা সাহিত্য তখনও নিষিদ্ধ বিষয়। ডারউইন বাড়িতে ছুটির সময় অগ্রজের সঙ্গে রসায়নবিদ্যার নানা পরীক্ষায় শরিক হন শুনে ড. বাটলার ক্ষুব্ধ হন। শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে লাঠৌষধিতে বিশ্বাসী এই স্কুল, নিজের ভাষায়, "তাঁর মনোবিকাশে চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল।" স্কুলে ভালো ফল দেখাতে না পারায় ডা. রবার্ট পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং অগত্যা পারিবারিক পেশাশিক্ষার জন্য তাঁকে ১৮২৫ সালে এডিনবরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু এখানেও একঘেয়েমিতে তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর মতে, "একমাত্র হোপের রসায়নবিদ্যার ক্লাস ছাড়া

আর সবই ছিল অত্যন্ত নিরস ও বিরক্তিকর।" সেই সময়কার অবেদনকহীন অস্ত্রোপচারের বীভৎস দৃশ্য দেখে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় ইতি টানার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেন। ফলত এডিনবরার দুটি বছরও বৃথা কাটে। এখানেও ডারউইন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমিতির অধিবেশনে নানা বিষয়ে বক্তৃতা শুনতেন, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে সংগ্রহ অভিযানে শরিক হতেন। নিয়মিত শিকারেও যেতেন। এইসব সংবাদ অচিরেই ডা. রবার্টের কাছে পৌছয় এবং প্রাজ্ঞ চিকিৎসক অনন্যোপায় হয়ে পুত্রকে পাদ্রি হওয়ার প্রস্তাব দেন। সেই-কালে এ-ধরনের কাজে সম্মান ও অর্থ দুটোই জুটতো। ডারউইন অবশ্য প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন ভিন্নতর কারণে, গ্রামীণ পরিবেশ নির্বিবাদ প্রকৃতি-নিরীক্ষা ও কীটপতঙ্গ সংগ্রহের জন্য সর্বোত্তম বলে।


আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ড

এই ধরনের পেশা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রিলাভের শর্তাধীন থাকায় ডারউইন ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন ১৮২৮ সালে। সহপাঠীরা সবাই বড় ঘরের ছেলে। পড়াশোনা যৎসামান্য, তারা সময় কাটায় ঘোড়দৌড়, শিকার, খানাপিনা ও আড্ডা-আয়েশে। ডারউইন অচিরেই তাদের দলে ভিড়ে যান। এখানেও প্রকৃতি-নিরীক্ষা ও সংগ্রহের নেশার কোনো রদবদল ঘটে না। নিয়মিত যান নানা বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে। এভাবেই পরিচিতি ও গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেনশ্লো ও ভূতত্ত্বের প্রফেসর অ্যাডাম সেজউইকের সঙ্গে। হেনশ্লোর অনুপ্রেরণাতেই তাঁর মনে প্রকৃতি পর্যবেক্ষকের বদলে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা জন্মে। তখনই হাতে আসে বিশ্বখ্যাত পরিব্রাজক ও নতুন নতুন উদ্ভিদ এবং প্রাণী সংগ্রাহক ব্যারন আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ড লিখিত নিরক্ষীয় আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী *Personal Narrative,* পড়েন সম্মোহিত হয়ে এবং আক্রান্ত হন ওই অঞ্চল সফর ও সেখান থেকে কিছু সংগ্রহের স্বপ্নে। এইসব খবরও বাড়িতে পৌছতো। পিতা উদ্বিগ্ন হতেন। ডারউইন অবশ্য এবার তাঁকে আর হতাশ করেন না। ১৮৩১ সালের জানুয়ারি মাসে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাসময়ে বাড়ি ফেরেন।

দক্ষিণ আমেরিকা সফরের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে ধর্মযাজকের চাকুরি নিয়ে নির্জন গ্রামীণ পরিবেশে কীটপতঙ্গ সংগ্রহে তুষ্ট থাকতে ডারউইন যখন মনস্থির করে ফেলেছেন, তখনই, সেই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো। ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক হেনশ্লোর একটি চিঠি পৌছয় এবং তাতে ছিলো অভাবিত সেই সুসংবাদ : দক্ষিণ গোলার্ধে জরিপকর্মে নিয়োজিত রাজকীয় নৌবাহিনীর 'বিগ্‌ল্‌' জাহাজে অবৈতনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নির্বাচন। ডা. রবার্ট প্রথমে আপত্তি জানালেও পুত্রের আগ্রহের কাছে শেষাবধি হার মানেন। ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর ডেভ্‌ন্‌পোর্ট থেকে 'বিগ্‌ল্‌' আপন গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে।



অধ্যাপক অ্যাডাম সেজউইক

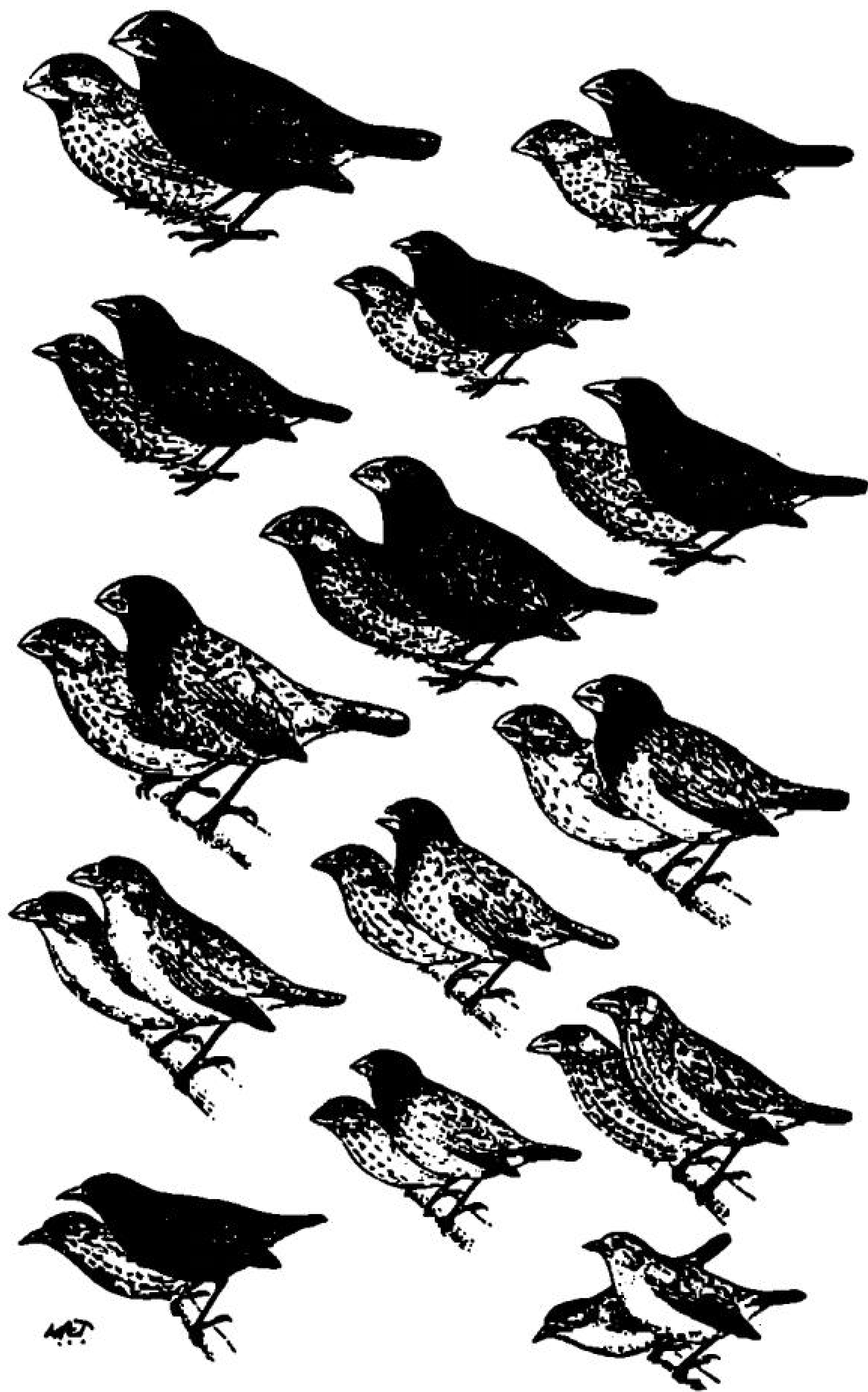
হেনশ্লো তাঁকে আপন যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হতে নিষেধ করলেও আসলে জীববিদ্যা বা ভূবিদ্যা কোনোটিতেই ডারউইনের যথাযথ প্রশিক্ষণ ছিলো না। বড়জোর তিনি একজন শৌখিন প্রকৃতিবিদ—এটুকুই বলা যেতো। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানার্জনের প্রবল তৃষ্ণা, অশেষ অধ্যবসায় ও মুক্তচিন্তার কল্যাণে 'বিগ্‌ল্‌' সফরেই তিনি শৌখিন প্রকৃতিবিদ থেকে একজন সার্থক বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরলে ডা. ডারউইন তাঁকে দেখামাত্র বলেছিলেন, তাঁর রীতিমত রূপান্তর ঘটেছে, মাথার খুলির গড়নটাও নাকি পাল্টে গেছে। মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকের এই পর্যবেক্ষণ মিথ্যে প্রমাণিত হয় নি। সেকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা আজকের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলো। প্রকৃতি ও জীবজগতের পরিবর্তনের নিয়মগুলো তখনও মানুষরে অজানা। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় পরিবর্তন, ভাঙাগড়া এবং জীবজগতের সৃষ্টি, বিলয় ও পুনর্সৃষ্টি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন আর এইসব রহস্যোদ্ধার মানুষের সাধ্যাতীত। তাই প্রবীণ সেজউইক ও হেনশ্লোর মতো তরুণ ডারউইনের মনেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিলো যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতিগুলো ঈশ্বরের সৃষ্টি ও অপরিবর্তনশীল। ওক গাছের বীজ থেকে ওকই জন্মায়, বাঘ কেবল বাঘই প্রসব করে এবং সৃষ্টির পর থেকে এগুলোর কোনোই পরিবর্তন ঘটে নি।

কিন্তু এই সাবেকি চিন্তায় বাদ সাধলো চার্লস্‌ লায়েলের *Principle of Geology.* এটি হেনশ্লো তাঁকে দেন। সেইসঙ্গে এটাও জানান যে, বইটি নানা

উদ্ভট তত্ত্বে ঠাসা, তিনি যেন ওগুলো এড়িয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর দিকেই নজর রাখেন। উদ্ভট কেন ? কারণ লায়েল ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ব্যাপারে নোহ্‌র মহাপ্লাবন জাতীয় মহাপ্রলয়কে ততোটা আমল না দিয়ে ব্যাত্যা, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা ইত্যাকার প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটি ইংল্যান্ডে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল। বলা বাহুল্য সেজউইকের মতো রক্ষণশীল ভূবিদ ও বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ গ্রহণ করেন নি।

'বিগল্' ১৮৩২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলের বোহিয়া বন্দরে নোঙর ফেলে। এখানেই ডারউইন প্রথম খুঁজে পান তাঁর ভবিষ্যৎ তত্ত্বের প্রথম সূত্র : টেক্সোডন নামের বিশাল অবলুপ্ত একটি জন্তুর মাথার ফসিল। অতঃপর আরেকটি—এবার আর্মেডিলার আত্মীয় অবলুপ্ত মেগাথেরিয়ামের চোয়াল। এগুলো জাহাজে তুললে জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্ রয় মন্তব্য করেন যে, জন্তুগুলো নোহ্‌র নৌকোয় উঠতে পারে নি বলেই নাকি মারা গেছে। প্রজাতিলুপ্তির অন্যতর কোনো তত্ত্ব তখন জানা ছিলো না। 'বিগল্' ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৩৪ সালের মে মাস পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব-উপকূল জরিপ করে। এই দু'বছর ডারউইন অধিকাংশ সময় মূল ভূখণ্ডে থেকেছেন, ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য দেখেছেন, নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির জীবন্ত এবং শিলীভূত নমুনা সংগ্রহ করেছেন। জাহাজ তাঁকে কোনো বন্দরে নামিয়ে দিত, তিনি কতক সঙ্গী নিয়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াতেন, খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতেন। জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে বন্দরে ফিরলে সংগ্রহসহ আবার তাতে সোয়ারি হতেন, নামতেন পরের বন্দরে— এভাবেই চলেছে চার বছরের গোটা সফর। সংগ্রহের জন্য লোকজন নিয়োগের খরচা যোগাতেন ডা. রবার্ট, সংগ্রহগুলো পার্সেলে পৌঁছুতো হেনশ্লোর কাছে এবং সেই সঙ্গে চিঠি মারফত নানা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট। জাহাজে থাকার সময় ডারউইন সংগৃহীত নমুনা ব্যবচ্ছেদ করতেন, নোট লিখতেন ও ভূবিদ্যাসহ নানা বইপত্র পড়তেন। হেনশ্লোর সৌজন্যেই বইগুলি তাঁর কাছে পৌঁছতো। ডায়েরি লেখা ছিলো


জন স্টিভেন্স হেনশ্লো



গ্যালাপেগস্ দ্বীপপুঞ্জের চড়ুই : পার্থক্য কেবল ঠোঁটের গড়নে। খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতার দরুনই এইসব প্রজাতির উদ্ভব।

ডারউইনের অন্যতম জরুরি নিত্যকর্ম।

ডারউইন ঢুঁড়ে বেড়ান ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের দূরদূরান্তের বনপ্রান্তর ও তৃণভূমি। আর্জেন্টিনার ভূগঠনে মহাপ্রলয়জাত কোনো পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়ে না, বরং লায়েলের ক্রমপরিবর্তনের সাক্ষ্যই লক্ষ্য করেন। এখানে লুপ্ত প্রজাতির অঢেল সংখ্যা তাঁকে বিস্মিত করে। মহাপ্রলয়ের অনুপস্থিতিতে তাহলে কেন কোনো কোনো প্রজাতির নির্বিশেষ বিলুপ্তি ঘটে? এইসব অঞ্চলের বাসিন্দা একটি ছোট জাতের উটপাখি (পরে নামকরণ করা হয়েছিল Rhea Darwini) আর অরণ্যের বদলে তৃণাঞ্চলে বিদ্যমান কয়েক জাতের কাঠঠোকরা দেখেও



অস্তিত্বের লড়াই : বিষধর সাপ আক্রমণ করছে হরবোলা পাখির বাসা

তিনি অবাক হন। স্বাভাবিক আকারের উটপাখি থাকা সত্ত্বেও আরেকটি ছোট জাতের উটপাখি কীজন্য? বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে কাঠঠোকরা সৃষ্টি হলো কী উদ্দেশ্যে? ডারউইন সঠিক উত্তর খুঁজে পান না। আরেকটি সমস্যাও তাঁকে বিব্রত করে : দক্ষিণ আমেরিকার বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর সঙ্গে জীবন্ত বহু প্রাণীর সাদৃশ্য। লুপ্ত টেক্সোডনের সঙ্গে বর্তমান ক্যাপিবারার, মেগাথেরিয়ামের সঙ্গে আর্মেডিলার সাদৃশ্য এতোই স্পষ্ট যে এদের আত্মীয়তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য। তবে কি ক্যাপিবারা ও আর্মেডিলা টেক্সোডন ও মেগাথেরিয়ামের রূপান্তরিত প্রকারভেদ ? প্রজাতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে তো এমনটি অসম্ভব। কিন্তু প্রজাতি বদলায়—এমন উচ্চারণ ঈশ্বরনিন্দার শামিল। লায়েলের মতো যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানীও এক্ষেত্রে অত্যন্ত রক্ষণশীল। ডারউইন আর ভাবতে পারেন না।

'বিগ্‌ল্' তার দোদুল্যচিত্ত প্রকৃতিবিজ্ঞানীকে নিয়ে ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গ্যালাপেগ্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে চ্যাথাম দ্বীপে নোঙর ফেলে। ইকুয়েডর রাজ্য থেকে ছ'শো মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলো অনাদিকাল থেকেই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ডারউইন চ্যাথাম দ্বীপে পা দিয়েই বুঝলেন এক সৃষ্টিছাড়া রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন : আগ্নেয়গিরির লাভার ঢল, সর্বত্র ছড়ানো কালো কালো পাথরের স্তূপ আর অদ্ভুত সব জীবজন্তু—পাথরের চাঙড়ের মতো ঢাউস কচ্ছপ, বেঢপ কুশ্রী গিরগিটির পাল, মানুষকে ভয় করে না এমন সব পাখি। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যান এবং কেবলই আশ্চর্য হন, এখানকার সবই নতুন—গাছপালা, জীবজন্তু, এমন কি মাছেরাও! সবচেয়ে বিস্মিত হন তেরো জাতের চড়ুই দেখে—একেক দ্বীপে একেক রকম : কারও ঠোঁট চিকন ছুঁচলো, কারও-বা টিয়েপাখির মতো মোটা, মাঝারি রকমফেরও আছে। ঠোঁটের গড়ন ছাড়া তারা অবিকল একই রকম, যেন কেবল খাদ্যাভ্যাসের নিরিখেই তৈরি। কেউ খায় ফল, কেউ শস্যের মোটা দানা, কেউ ক্যাকটাসের ফুল, কেউ-বা পোকামাকড়। অচিরেই আরও বিস্ময়কর একটা তথ্য ধরা পড়লো। না, চড়ুইগুলো আদ্যন্ত নতুন নয়, মূল ভূখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার চড়ুইদের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও বটে। তবে?


ড্যাল্টন হুকার

পাখিগুলো কি তা হলে এখানে কোনোক্রমে পৌঁছে নতুন পরিবেশে খাদ্যাভ্যাস বদলাতে বাধ্য হতে গিয়েই শেষাবধি এই আকৃতি পেয়েছে? প্রজাতি কি তা হলে বদলায়? প্রজাতির রূপান্তর তবে সম্ভব? এই চড়ুইগুলো তবে নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা, কেউ তাদের সৃষ্টি করে নি? এই চড়ুইদের ক্ষেত্রে যা সত্যি, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটা মিথ্যে হবে কেন? ভাবনা-গুলো তিনি সযত্নে নোটবুকে লিখে রাখেন, কোনো সিদ্ধান্ত টানেন না, তবে প্রজাতির রূপান্তর সম্পর্কে অতঃপর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রজাতি যে বদলায়, সেটা কোনো নতুন তথ্য নয়। লামার্ক ও এরেসমাস বহুকাল আগেই সেটা বলে গেছেন। কিছু প্রজাতি কীভাবে বদলায়, তার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কি, এই চিন্তা অনুক্ষণ ডারউইনকে বিব্রত করে। কেউ তো নিজের চোখে প্রজাতির রূপান্তর দেখে নি, দেখা সম্ভবও নয়।


চার্লস্ লায়েল

গ্যালাপেগস্ থেকে 'বিগ্‌ল্' নিউজিল্যান্ড হয়ে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ঘুরে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আবার ব্রাজিলের উপকূল ছুঁয়ে উত্তর আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে চার বছর এক মাস পর ১৮৩৬ সালের ২ অক্টোবর কর্ন্‌ওয়ালের ফালমাউথ বন্দরে ফেরে। শ্রুস্‌বেরি এসে কিছুদিন থাকার পর ডারউইন লন্ডনের গ্রেট মালবরো স্ট্রিটে বাসা নেন এবং আপন সংগ্রহ শনাক্ত ও চব্বিশটি নোটবুক থেকে 'বিগ্‌ল্' সফরের কাহিনী ও পর্যবেক্ষণ নিয়ে একটি বই লেখায় ব্যস্ত থাকেন। ইতিমধ্যে হেনশ্লোর কাছে পাঠানো ফসিল ও অন্যান্য নমুনা বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। হেনশ্লো প্রবাসী ডারউইনের চিঠিগুলো বিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনে পড়তেন এবং কখনো কখনো ছাপিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিলিও করতেন। ফলত বিজ্ঞানী হিসেবে ডারউইনের প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। সেজউইক ডা. রবার্টের সঙ্গে দেখা করে পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁকে আশ্বস্ত করেন। ফলত 'বিগ্‌ল্' ভ্রমণ শেষে লন্ডনের বাসিন্দা হওয়ার পর ডারউইন স্বচ্ছন্দেই সেখানকার বিজ্ঞানীসমাজে ব্যাপক মেলামেশার সুযোগ পান। এই সময় বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হন ভূবিদ চার্ল্‌স্ লায়েল ও বৃক্ষবিদ ডাল্টন হুকারের সঙ্গে। এই দুই বিজ্ঞানী তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের

সঙ্গে কতোটা গভীরভাবে জড়িত হবেন, সে ছিলো তখনও কল্পনাতীত। ফসিল নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেন বৃটিশ মিউজিয়ামের প্রত্নজীববিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ রিচার্ড ওয়েনের সঙ্গে। এই হার্দ্য সম্পর্কটিও যে শেষাবধি তিক্ততার তুঙ্গে পৌঁছুবে তাও তখনো জানা ছিলো না। লন্ডনবাসী অগ্রজ এরেসমাসের সৌজন্যে পরিচিত হন বিজ্ঞানবৃত্তের বাইরের ম্যাক্‌লে, কার্ললাইল ও সিড্‌নি স্মিথের মতো পণ্ডিতদের সঙ্গে। অভাবিত সাক্ষাৎ ঘটে হামবোল্ডের সঙ্গেও। যাঁর বই পড়ে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই নায়কটিই একদিন স্বয়ং হাজির হন ডারউইনের বৈঠকখানায়। হামবোল্ডের সঙ্গে আলোচনার ফলে বলতে গেলে তাঁর স্বপ্নভঙ্গই ঘটে। ডারউইনের ভাষায়, "আমি কিছুটা নিরাশই হলাম, সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল আতিশয্য-দুষ্ট।"

লন্ডনে দু'বছরে ডারউইন 'বিগ্‌ল্‌' ভ্রমণের ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিদ্যা পর্যবেক্ষণ বিষয়ে লেখালেখির সময় মুহূর্তকালও 'প্রজাতির বিবর্তন' সমস্যাটি ভুলতে পারেন নি। বিষয়টি এমনই স্পর্শকাতর যে, এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনাও তখন অসম্ভব ছিল। এই দুর্গম পথে তিনিই একক যাত্রী—নিঃসঙ্গ, সন্ত্রস্ত। কীভাবে প্রজাতির পরিবর্তন ঘটে? লামার্কের ব্যাখ্যা তিনি আগেই বাতিল করেছেন। প্রবল ইচ্ছেশক্তি বা অদম্য চেষ্টা এক্ষেত্রে নিরর্থক। বাঘ চাইলেই তার গায়ে ডোরা জন্মাবে না, জিরাফ প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার গলার দৈর্ঘ্য বাড়াতে পারবে না।

অচিরেই জীববিদ্যার খুব সাধারণ তত্ত্ব বিবর্তনের একটি চাবিকাঠি যোগালো। সবারই জানা, মা-বাবার সব সন্তানই অবিকল অভিন্ন হয় না। মানুষ, গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে এমনটি হামেশাই চোখে পড়ে। ঠিক এরকম ব্যাপার নিশ্চয়ই বন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে। ডারউইন এই পরিবর্তনের নাম রাখলেন ভ্যারিয়েশন বা পরিবৃত্তি। বংশপরম্পরায় হাজার হাজার বছরে এইসব পরিবৃত্তি সঞ্চয়ের মধ্য দিয়েই হয়তো পুরনো প্রজাতি থেকে একটি নতুন প্রজাতি জন্মায়। বাঘের গায়ের দু'একটি ফোঁটার মতো সামান্য পরিবৃত্তি থেকেই তার সারা গায়ে ডোরা দেখা দেয়, সামান্য লম্বা গলার একটি জিরাফ থেকে লক্ষ লক্ষ বছরে অস্বাভাবিক গলাঅলা আজকের জিরাফ জন্মানো তা হলে অসম্ভব নয়। ডারউইন এক ঝলক আশার আলো দেখতে পান।

কিন্তু লায়েলের সঙ্গে আলোচনায় এক ফুৎকারে এই আলোটুকু নিভে যায়। লায়েল বলেন, এইসব পরিবৃত্তি, হোক ছোট কিংবা বড়, প্রকৃতিতে প্রশ্রয় পায় না। মাতৃপ্রজাতি প্রকৃতির সঙ্গে আদর্শভাবে অভিযোজিত বিধায় ওইসব পরিবৃত্তির সন্তানরা অবশ্যই নিকৃষ্ট হবে এবং জীবন-সংগ্রামে শৈশবেই মারা

যাবে। সত্যিই তো, ডারউইন ভাবলেন, মানুষের নাক বা হাত নানা দৈর্ঘ্য ও আকারের হলেও সেগুলো কখনই গড়মাপ অতিক্রম করে না। এমনটি ঘটলে ফোঁটা থেকে ডোরা কিংবা সামান্য লম্বা গলা থেকে অস্বাভাবিক বহরের গলা জন্মানো তো সত্যিই অসম্ভব !

আবার সেই অন্ধকারে পথ হাতড়ানো। সেই অনিশ্চিত গোলকধাঁধায় ঘুরে মরা। হঠাৎ লায়েলের যুক্তিতেই একটি প্রতিযুক্তির খোঁজ মেলে। মাতৃপ্রজাতি পরিবেশের সঙ্গে আদর্শভাবে অভিযোজিত কেন? লায়েল নিজেই তো তাঁর ভূতত্ত্বে দেখিয়েছেন যে পৃথিবী ভৌত কাঠামো বদলায়, পরিবেশ বদলায়, জলবায়ু বদলায়। তা হলে? আজ যে-পরিবেশে যে-প্রজাতি আদর্শভাবে অভিযোজিত, এক লক্ষ বছর পর সেই পরিবেশ বদলালে সে আর আদর্শভাবে অভিযোজিত থাকছে কই? হতে পারে পরিবৃত্তিধর সন্তানদের কেউ কেউ তখন নিজেদের পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্যের দৌলতে মাতৃপ্রজাতির তুলনায় সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিক অভিযোজিত হবে। আবার আলো জ্বলে ওঠে, গাঢ় অন্ধকার আবারও পিছু হটে। ডারউইন ভাবেন, লায়েলের কথা সত্য হলে কৃষকরা এতো জাতের ফসল ও গৃহপালিত পশুপাখি জন্মালো কীভাবে? নিশ্চয়ই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পছন্দসই পরিবৃত্তিগুলি বাছাই করে। প্রক্রিয়াটি প্রকৃতিতেও কার্যকর থাকা সম্ভব। কৃষকের মতো প্রকৃতিও তো একজন নির্বাচনবিদ হতে পারে। পারে কি? আর্জেন্টিনার কথা মনে পড়ে। ওখানকার ভূতত্ত্বে কোনো মহাপ্রলয়ের চিহ্ন নেই, সেখানে নোহ্‌র মহাপ্লাবনও ঘটে নি, অথচ প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহু। কেন তারা নিশ্চিহ্ন হলো ? তবে কি প্রকৃতিই তাদের বিলোপ ঘটিয়েছে, তবে কি সে-ই টেক্সোডন ও মেগাথেরিয়ামকে হটিয়ে যথাক্রমে ক্যাপিবারা ও আর্মেডিলাকে তাদের স্থলবর্তী করেছে ? ব্যাখ্যাটি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু গোটা জীবজগতের বিবর্তন ব্যাখ্যার পক্ষে স্পষ্টতই দুর্বল। চাই নিখুঁততর যুক্তিবিন্যাস, বলিষ্ঠতর বক্তব্য।

তখনই সেই ঘটনাটি ঘটে। ১৮৩৮ সালের অক্টোবর। নেহাত কৌতূহলবশেই ইংল্যান্ডের জনৈক স্কুল শিক্ষক টমাস ম্যালথাস লিখিত *An Essay on the Principles of Population* (১৭৯৮) পুস্তিকাটি পড়ছিলেন। লেখকের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে, অর্থাৎ একটি দম্পতির চারটি সন্তান জন্মালে, তারা সকলে বেঁচে থাকলে, যথাসময়ে বিয়ে-থা প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকলে দশ প্রজন্মে অর্থাৎ প্রায় দুশো বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়বে ৫১২ গুণ, একাদশ প্রজন্মে হবে ১০২৪ গুণ, দ্বাদশ প্রজন্মে ২০৪৮ গুণ। কিন্তু বাস্তবে এমনটি ঘটে না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃত্যু ইত্যাকার ঘটনা জনসংখ্যা সীমিত রাখে।

বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হলো, "এই পরিস্থিতিতেই অনুকূল পরিবৃত্তিগুলো সংরক্ষিত হবে। অনুপযোগীরা লোপ পাবে। ফলত উৎপত্তি ঘটবে নতুন প্রজাতির।" অবশেষে, এখানেই কাজ করার মতো একটি তত্ত্বের সন্ধান পেলেন।

১৮৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে ডারউইনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সংসারী হওয়া উচিত কি না, এ নিয়ে প্রভূত দ্বিধাদ্বন্দ্বে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে শেষে বিয়ে করেন চিনামাটির প্রসিদ্ধ বাসনকোসন প্রস্তুতকারী ওয়েজউড পরিবারের কন্যা, তাঁর আত্মীয়া এমা ওয়েজউডকে। বিয়ের কিছুকাল আগেই আজীবনসঙ্গী এক অজ্ঞাত রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেয়েছিলো, যা থেকে ডারউইন আর কোনোদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। বিয়েটি ছিল, বলা যায়, মণিকাঞ্চনযোগ। স্বামী ক্রনিক রোগী, স্ত্রী আদর্শ নার্স। অসুস্থতা সত্ত্বেও ডারউইন দীর্ঘ পরমায়ু পান, সাতটি ছেলেমেয়ে ও অসংখ্য আত্মীয় অতিথি-অভ্যাগতসহ জমাট সংসার গড়ে তোলেন, আমৃত্যু গবেষণায় নিবিষ্ট থাকেন, যুগান্তকারী সব গ্রন্থ রচনা করেন এবং বলা বাহুল্য, এই সবই সুষ্ঠুভাবে ঘটেছিল বহুলাংশে এমার ধৈর্য, দক্ষতা, দৃঢ়চিত্ততা, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার সুবাদে। তিয়াত্তর বছর বয়সে তাই শেষ নিশ্বাস ফেলার পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি ভোলেন নি।

বিয়ের পর আরও প্রায় দু'বছর ডারউইন লন্ডনে কাটান। তখনো 'বিগ্‌ল্‌' ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ নিয়ে লেখালেখি চলছে, বক্তৃতা দিচ্ছেন ভূতত্ত্ব সমিতির অধিবেশনে। নিশ্চিন্ত জীবন। অর্থাভাব নেই। পিতার ব্যবস্থায় বার্ষিক ১৩০০০ পাউন্ড আয় নিশ্চিত। তদুপরি ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কন্যা স্ত্রী এনেছেন মোটা অঙ্কের যৌতুক। একে একে সংসারে আসে নতুন নতুন মুখ—পুত্র উইলিয়াম (১৮৩৯, ডিসেম্বর), তার দু'বছর পর কন্যা এ্যানি। কিন্তু অসুখ বেড়েই চলে—অনিদ্রা ও গভীর ক্লান্তি।

এরপর শহরের কোলাহলময় পরিবেশ ছেড়ে প্রকৃতির গভীরে নির্জন এলাকায় বাড়ি কেনেন ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। লন্ডনের অদূরে কেন্টের ডাউন গ্রামের সেই ভবনেই তারপর কাটে তাঁর গোটা জীবন। এখানেই সাধনা ও সিদ্ধিলাভ। লাগাতার অসুস্থতার দরুন বাইরে বিশেষ কোথাও যাতায়াত সম্ভব হতো না। মাঝেমধ্যে লন্ডন, কখনো হাওয়া বদলের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায়, দৈবাৎ পিতৃভবন শ্রুস্‌বেরি। অবশ্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী বিজ্ঞানীরা প্রায়ই ডাউন-ভবনে আসতেন। হেনশ্লো, লায়েল ও হাক্সলি এসেছেন। হুকার প্রায়ই একনাগাড়ে অনেকদিন থাকতেন, ডারউইনকে 'বিগ্‌ল্‌' ভ্রমণের

উদ্ভিদপ্রজাতি শনাক্তি ও বিশ্লেষণে সাহায্য করতেন। 'বিগ্‌ল্' জাহাজের ক্যাপটেন ফিট্‌স্‌রয়ও এসেছিলেন, অবশ্য ভিন্ন উদ্দেশ্যে, 'ধর্মবিরোধী' বিধায় প্রজাতির উৎপত্তি গবেষণা থেকে ডারউইনকে নিরস্ত করতে। বলা বাহুল্য, সফল হন নি।

জীববিবর্তনের চিন্তাভাবনা নিবিড় হওয়ার সঙ্গে যেন তাল মিলিয়েই রোগের প্রকোপ বেড়ে চলে। তবু ১৮৪২-১৮৪৬ সালে *'প্রবালপ্রাচীর'* (*Coral Reefs*) ছাপাখানায় পাঠিয়েই প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত 'তত্ত্বের' একটি সারসংক্ষেপ রচনা করেন। পেন্সিলে লেখা মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠার এই নিবন্ধটি দু'বছর পর ২৩০ পৃষ্ঠার একটি পূর্ণাকার গ্রন্থের পরিসর পায়। লায়েল ও হুকার দু'জনই পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। কিন্তু তত্ত্বটি তাঁদের অনুমোদন পায় না। তাঁরা তখনো প্রজাতিকে ঈশ্বরসৃষ্ট ও অপরিবর্তনশীল ভাবতেন। অগত্যা ডারউইন পাণ্ডুলিপিটি সরিয়ে রেখে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন। চিলির সমুদ্রকূল থেকে সংগৃহীত কবচি সিরিপিডা নিয়ে গবেষণা চলে পুরো আট বছর, ব্যবচ্ছেদ করেন প্রায় ১০,০০০ নমুনা। ১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিপিডা মনোগ্রাফের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠান। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে ডারউইন কখনোই তাঁর 'তত্ত্বের' কথা বিস্মৃত হন নি, সময় এখনো অনুকূল নয় ভেবে নিশ্চুপ থেকেছেন। ভালোই জানতেন কেউ তাঁর ব্যাখ্যা শুনবে না, সবাই তাঁকে ধর্মদ্রোহী নাস্তিক বলে অভিযুক্ত করবে। মনে পড়ে থাকবে রবার্ট চেম্বার্সের *Vestiges of the Natural History of creation* (১৮৪৪) বইটির ভাগ্যের কথা। বিবর্তনের পক্ষে লিখিত বইটি খ্যাতির বদলে কেবল নিন্দাই কুড়িয়েছিল এবং সেজউইকের মতো বিজ্ঞানীও লেখককে 'ইডেন উদ্যানের শয়তান' আখ্যায়িত করেছিলেন। লায়েলও 'তালগোল পাকানো ভাবনার গোঁজামিল' বলে তাঁকে নাকচ করে দেন। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ডারউইন প্রত্যাশা করেন নি।

'তত্ত্বের' সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য খুঁত খুঁজে খুঁজে ডারউইন বিনিদ্র রাত কাটান। নিজের তৈরি গ্রিনহাউসে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাঁর মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চান। কৃষিবিদ ও প্রজনবিদদের চিঠিপত্র লিখে আনুষঙ্গিক তথ্যাদি যোগাড় করেন। তারপর কয়েক হাজার পৃষ্ঠার এই বৃহৎগ্রন্থ রচনায় হাত দেন। ডারউইনের বন্ধুদের মধ্যে লায়েল ছিলেন ঈর্ষণীয় বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী। অচিরেই ডারউইনের প্রজাতি-ভাবনা গ্রন্থাকারে না বেরুলে অন্য কেউ তত্ত্বটি প্রকাশ করবে এবং ডারউইন অগ্রাধিকার হারাবেন এমন একটি আশঙ্কার কথা তিনি তাঁকে জানান। কিন্তু ডাউনগাঁয়ের বৃদ্ধ তপস্বী তাতে কর্ণপাত করেন না। অবশিষ্ট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিজ্ঞানী আপনার পরিকল্পিত মহাগ্রন্থ

রচনায় তখন নিবিষ্ট, কাজ চলছে অবিরাম, গ্রন্থের আয়তন বাড়ছে প্রতিদিন।

১৮৫৮ সালের ১৪ জুন ইস্ট ইন্ডিজ থেকে একটি চিঠি পৌঁছয় ডাউন গ্রামে। লেখক জনৈক অখ্যাত ইংরেজ নিসর্গী, রবার্ট ওয়ালেস, বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ, ডারউইনের সঙ্গে পত্রমাধ্যমে পরিচিত। পত্রপাঠে ডারউইন স্তম্ভিত, হতবাক— এ যে তাঁরই প্রজাতি-চিন্তার সারসংক্ষেপ। তিনি লায়েলকে ঘটনাটি জানিয়ে লিখলেন, '১৮৪২ সালে আমার লেখা পাণ্ডুলিপিটি ওয়ালেসের কাছে থাকলেও এতোধিক উন্নততর সারাংশ লেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না।' লায়েলের আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হলো। এ ছিলো দু'জন বিজ্ঞানীর স্বতন্ত্রভাবে অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছার একটি বিরল দৃষ্টান্ত। কিন্তু ডারউইনের অগ্রাধিকার রক্ষা বিজ্ঞানের স্বার্থে জরুরি বিধায় লায়েল ও হুকারের উদ্যোগে ডারউইনের অগ্রাধিকার অক্ষুণ্ন থাকলো, তবে এই তত্ত্বের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেলো ওয়ালেসের নামটিও। আজও আমরা জীববিবর্তনের এই মতবাদকে ডারউইন-ওয়ালেস তত্ত্ব বলে থাকি।



রবার্ট ওয়ালেস

অতঃপর ডারউইন কয়েক হাজার পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা বাতিল করে মাত্র ৫০০ পৃষ্ঠায় সেটা কমিয়ে আনেন। ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে পাণ্ডুলিপি রচনা শেষ হয় ও *The Origin of species by means of natural selecton or the preservation of favoured races in the struggle for life*, সংক্ষেপে *Origin of Species* বেরোয় সেই বছরেরই নভেম্বর মাসে। সাধারণ সবুজ কাপড়ে বাঁধাই ও ১৫ শিলিং দামের বইটির প্রথম সংস্করণের ১২৫০ কপির সবগুলো প্রথম দিনই বিক্রি হয়ে যায়।

আবারও বলা প্রয়োজন যে, ডারউইন খোদ বিবর্তনতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন নি, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটির একটি যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কীভাবে বিবর্তন বা প্রজাতির ক্রমরূপান্তর ঘটে তিনি সেটাই দেখিয়েছেন মাত্র। প্রক্রিয়াটি যেহেতু অবিরাম লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী ও লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যাপার, সেজন্য কারও পক্ষেই সেটা স্বচক্ষে দেখা প্রশ্নাতীত। তাই পরোক্ষ প্রমাণ ও যুক্তিই এক্ষেত্রে প্রবক্তার মূল আশ্রয়। গোটা তত্ত্বটিকে সেজন্য নিখুঁত ও দুর্ভেদ্য করা প্রয়োজন ছিল আর তাই ডারউইন তাতে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্য ও প্রমাণাদি যোগ করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ততোটা সম্ভব না হলেও *'প্রজাতির উৎপত্তি'* নিঃসন্দেহে

এই জাতীয় সবগুলো রচনার তুলনায় অনেক বেশি সুসম্পূর্ণ এবং সেজন্যই এতোটা আলোড়নকারী। ওয়ালেসের কয়েক পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধের পক্ষে তা অসম্ভব ছিলো।

'প্রজাতির উৎপত্তি' গ্রন্থের সারমর্ম কয়েক পঙ্ক্তির সীমিত পরিসরেও ব্যক্ত করা যায়। জীবমাত্রেই জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু বেঁচে থাকার অবলম্বনগুলো সেই হারে বাড়ে না, ফলত দেখা দেয় প্রচণ্ড লড়াই—একই প্রজাতির বংশধরদের মধ্যে, বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে। বংশানুসৃত পরিবৃত্তি জীবের চরিত্রধর্ম, তাই প্রত্যেক প্রজাতির সন্তানরা মা-বাবা, ভাইবোন থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। খাদ্য, স্থান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু নিয়ে জীবদের মধ্যে যখন প্রচণ্ড লড়াই বাধে, তখন ওইসব পরিবৃত্তির কোনো কোনোটি কিছুটা সুবিধাজনক হলে ওই ভাগ্যবানরা এই কঠোর 'অস্তিত্বের সংগ্রামে' টিকে যায়, অনুকূল পরিবৃত্তিহীন দুর্ভাগাদের নির্বিশেষ মৃত্যু ঘটে। আমরা জানি নৈশ-প্রজাপতি বা মথের সাদা ভ্যারাইটি গ্রামাঞ্চলের গাছের বাকলের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে, আর কালোরা শহরের ধোঁয়াটে মলিন পরিবেশে অনুরূপ সুযোগ পায়। কিন্তু উল্টোটি অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকার অনুকূল নয়। তাই গ্রামে কালো ও শহরে সাদা রঙের মথ দুর্লভ। কিন্তু রঙের এই বৈচিত্র্য রাতারাতি ঘটে নি। বহু প্রজন্মের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তারা নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে সুঅভিযোজিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবেশ পাল্টালে তাদের ভাগ্যও পাল্টাবে, আবার নতুন করে অস্তিত্বের লড়াই শুরু হবে, সেখানে অনুকূল পরিবৃত্তিধর শেষ পর্যন্ত জিতবে, অন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই পরিবৃত্তি হলো বিবর্তনের কাঁচামাল, 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' হলো বিবর্তনের চালিকাশক্তি আর শেষ বিচারে প্রকৃতি হলো প্রধান নির্বাচক। তাই তো ডারউইনবাদের অন্য নাম—প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন।

কৃষকরা অজান্তেই হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের এই উপাদানগুলো কাজে লাগিয়ে আসছেন। বীজতলায় তারা বীজ বোনেন ঘন করে, যাতে চারাগুলো নিজেদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতায় বয়স্ক হতে থাকবে, কিন্তু উঁচু লকলকে হবে না। এটাই তো আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। তারা ফসল থেকে আগাছা তুলে ফেলেন, পশুর গা থেকে আঁঠাল উকুন প্রভৃতি পরজীবী বেছে তাদের সুস্থ রাখেন, বন্যজন্তুদের হামলা এড়ানোর জন্য গোয়ালঘরে শক্ত বেড়া দেন। অন্যথায় আগাছা আন্তঃপ্রজাতিক লড়াইয়ে ফসলকে হটিয়ে দিয়ে খেতগুলিতে সাবেক জঙ্গল বানাতো, মাংসভুক ও রক্তচোষারা গৃহপালিত



লন্ডনের রিজেন্ট পার্কের চিড়িয়াখানায় অনেক ধরনের গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন চার্লস ডারউইন

পশুদের উজাড় করে গোয়াল শূন্য করে ফেলতো। আজ যে আমরা এতো জাতের গৃহপালিত পশুপাখি (ডারউইন নানা জাতের কুকুর ও হরেক রকম পায়রার দৃষ্টান্ত বারবার উল্লেখ করেছেন) ও ফলফসল দেখি, এগুলোর সবক'টিই তো বুনো নিকৃষ্টতর পূর্বপুরুষ থেকে কৃষকরা পছন্দসই বৈশিষ্ট্য বা পরিবৃত্তি বাছাইয়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন। তাই ডারউইনের মোক্ষম যুক্তি : মানুষ যদি তার সীমিত শক্তি ও সভ্যতার সীমিত কালপর্বে ধৈর্যসহকারে পরিবৃত্তি নির্বাচনের মাধ্যমে এতোসব ফলফসল ও গৃহপালিত পশুপাখি জন্মাতে পারে, তা হলে প্রবল শক্তিধর প্রকৃতি, যার হাতে সময় অনন্ত, তার পক্ষে নির্বাচনের মাধ্যমে পৃথিবীর কয়েক লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন?

ডারউইন স্বকাল, সংস্কার, বিজ্ঞানীদের কূপমণ্ডুকতা ও ঈর্ষার বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর তত্ত্বের কাঠামোটিকে দুর্ভেদ্য করে গড়েন। আপন বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণপঞ্জি খাড়া করেছেন বিজ্ঞানজগৎ মন্থন করে। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই তার কাঠামো সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা লাভ সম্ভব : গৃহপালনে সৃষ্ট প্রকারভেদ (variation under domestication), প্রকৃতির রাজ্যে সৃষ্ট প্রকারভেদ (variation under nature), অস্তিত্বের সংগ্রাম (struggle for existence), প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection), প্রকারভেদ সৃষ্টির নিয়ম (laws of variation), তত্ত্বের সমস্যাবলি (difficulties of theory), সহজাতপ্রবৃত্তি (Instinct), সঙ্করতা (Hybridism), ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের অসম্পূর্ণতা (on the imperfection of the geological record), জীবের ভূতাত্ত্বিক পরম্পরা (on the geological succession of organic beings), ভূ-বিস্তারণ (geographical distribution), জীবের পারস্পরিক সাদৃশ্য-সম্পর্ক : অঙ্গসংস্থান, ভ্রূণতত্ত্ব, ক্ষয়িষ্ণু উপাঙ্গসমূহ (mutual affinities of organic beings, morphology, embryology, rudimentary organs), পুনরালোচনা ও উপসংহার (recapitulation and conclusion). প্রতিটি অধ্যায়ের গড় পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৪০। বলা বাহুল্য, *'প্রজাতির উৎপত্তি'* বিজ্ঞান-কল্পনার এক বৈপ্লবিক মহাকর্ম এবং লেখকের মৌলিকত্ব নিঃসন্দেহে গ্যালিলিও বা নিউটনের সমতুল্য।

বইটি প্রকাশের দু'সপ্তাহের মধ্যেই ডাউনগাঁয়ের ঠিকানায় চিঠির ঢল নামলো। না, সবই বিরূপ মন্তব্য। ডারউইন উদ্বিগ্ন হন। আসেন লন্ডন। দেখা করেন পুরনো বন্ধু ও অগ্রজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। না, কোথাও সমর্থন মেলে না। কানাঘুষো শুনতে পান : বইটি ভালো, তবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৃটিশ মিউজিয়াম শত্রুপুরি হয়ে ওঠে। ধূর্ত ওয়েন প্রকাশ্য শত্রুতা এড়িয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র ফাঁদেন।

হেনশ্লো, হুকার ও লায়েল নিশ্চুপ। টমাস হাক্সলি তাঁর তত্ত্বকে একটি প্রকল্প (hypothesis) বলে উল্লেখ করেন। সেজউইক গভীর দুঃখের সঙ্গে জানান যে বইটি পড়ে তিনি দারুণ মর্মাহত। ডারউইন ক্রমে ইংল্যান্ডে 'একজন মারাত্মক বিপজ্জনক ব্যক্তি' হয়ে ওঠেন। ক্যাপ্টেন ফিট্‌স্‌রয় ডারউইনকে 'কেউটে সাপ' বলে গালি দেন এবং 'বিগ্‌ল্' জাহাজে তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার পাপ স্খলনের জন্য বিনামূল্যে বাইবেল বিলি শুরু করেন। আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক লুই আগাসি বোস্টন প্রকৃতিবিজ্ঞান সমিতির অধিবেশনে ডারউইনের মতবাদকে 'দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত হলেও আসলে ভ্রান্ত' বলে নাকচ করে দেন। জার্মানি ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মহলে ডারউইনবাদ আলোচনার অযোগ্য ঘোষিত হয়। অনেকেই তত্ত্বটিকে অঙ্কুরে বিনাশের হুমকি দেন। সন্ত্রস্ত ডারউইন ডাউনগাঁয়ের নির্জনতায় আত্মগোপন করেন। বাকবিতণ্ডায় অনীহ, অসুস্থ ও নার্ভাস প্রকৃতির এই চিন্তকের অন্যতর কোনো গন্তব্য ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে ১৮৬০ সালের জুন মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে British Association for Advancement of Science-এর সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন বসে। বলা বাহুল্য, 'ডারউইনবাদ' সম্পর্কে সেখানে একটি আলোচনা অনিবার্য ছিল এবং সেজন্য তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ৩০ জুন, শনিবার। অত্যন্ত সুসংগঠিত বিপক্ষ দলের প্রতিনিধি ছিলেন অক্সফোর্ডের বিশপ, বিখ্যাত বাগ্মী স্যামুয়েল উইলবারফোর্স। দোদুল্যমানতা এড়াতে ব্যর্থ ডারউইনের বন্ধুমহল শেষ পর্যন্ত টমাস হাক্সলিকেই তাঁদের মুখপাত্র দাঁড় করান।

যথাসময়ে সভা শুরু হয়। সভাপতি ডারউইনের শিক্ষক অধ্যাপক হেনশ্লো। 'বানরতত্ত্ব' আলোচনার এই সভায় তিলধারণের স্থান নেই। 'জয় বিশপ' স্লোগানে মুখরিত সভাকক্ষ। প্রথমে মঞ্চে এলেন উইলবারফোর্স— দৈত্যাকার দেহ, ভরাট কণ্ঠস্বর, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। গির্জা ও রক্ষণশীলতার এই প্রতিনিধিটি রিচার্ড ওয়েনের শেখানো বুলি ছাড়া বিজ্ঞানের কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি শ্রোতাদের সহজেই ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি উৎপত্তির তত্ত্বকে নানা ভ্রান্ত উপমায় হাস্যাস্পদ করেন এবং শেষে কৃত্রিম বিনয়ে হাক্সলির কাছে জানতে চান—পিতৃ না মাতৃ কোন্ বংশধারায় তিনি বানরজাতির উত্তরাধিকারী? সভাকক্ষে উল্লাসের বিস্ফোরণ ঘটে, যেন জয় হলো বিশপের। কিন্তু বিশপের শেষ বাক্যে হাক্সলি বুমেরাঙের ছায়া দেখেন।

মঞ্চে আসেন টমাস হাক্সলি। বিশপের বিপরীত একহারা চেহারার এই মানুষটি খনিবিদ্যালয়ের প্রত্নজীববিদ্যার অধ্যাপক, মুখাবয়বে সুস্পষ্ট দৃঢ়তা,

বিজ্ঞানী হিসেবেও স্বনামখ্যাত। ধীরে, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ডারউইনবাদের বৈজ্ঞানিক মর্মসার ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর একে একে বিজ্ঞানে উইলবারফোর্সের অজ্ঞতাগুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরলেন। এও বললেন যে, বিশপের কুযুক্তিতে ডারউইনবাদে কারও বিশ্বাস যে টলে নি তাতে তিনি নিশ্চিত এবং শেষে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে যোগ করলেন, 'আমি বংশসূত্রে বানর জাতির উত্তরাধিকারী হতে মোটেই লজ্জিত নই, কিন্তু যে-লোক জ্ঞানত সত্যকে বিকৃত করে, তেমন কোনো ভণ্ডের সঙ্গে আপন সম্পর্ক স্বীকারে অবশ্যই কুণ্ঠিত হবো।'


টমাস হাক্সলি

মুহূর্তে পরিবেশ যেন জাদুমন্ত্রে বদলে গেলো। দর্শকদের উচ্ছ্বসিত করতালিতে অভিনন্দিত হলেন হাক্সলি এবং নিজের খোঁড়া কবরেই চাপা পড়লো উইলবারফোর্সের যাবতীয় খ্যাতি। হাক্সলির পর তরুবিদ হুকারও কিছু বলে প্রতিপক্ষের অজ্ঞতার অন্ত্যেষ্টিই সমাধা করলেন। এভাবেই সূচিত হয়েছিলো জীববিজ্ঞানের এক বিপ্লব ও বিশ্ববীক্ষায় বিজ্ঞানের অটল অনুপ্রবেশ, নির্বিশেষে নির্ধারিত হয়েছিলো বিবর্তনবাদের বিজয় ও ডারউইনের প্রতিষ্ঠা।

ডারউইনের বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে, লম্বা দাড়ি রেখেছেন ও চেহারায় একটি ঋষিভাব ফুটে উঠেছে, তবে স্বাস্থ্যের কোনোই উন্নতি হয় নি। ইতিমধ্যে পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। অসুস্থতার জন্য তাঁর অন্ত্যেষ্টিতেও যেতে পারেন নি। সংসারের পরিধিও বেড়েছে। সাতটি সন্তান। কিন্তু নিত্যকর্মের কোনোই পরিবর্তন নেই। সবই চলছে ঘড়ির কাঁটার মতো। আলো ফোটার আগেই প্রাতর্ভ্রমণ। সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একটানা গবেষণা, মাঝখানে ন'টায় শুধু বারেকের জন্য চিঠি-পত্র দেখা। দুপুরে আরেক দফা ভ্রমণ, সঙ্গে প্রিয় কুকুর পলি। নিজের লাগানো গাছ-পালার ছায়াঘন একটি পথ, তাঁরই দেওয়া নাম স্যান্ড-ওয়াক, সেখানেই ঘুরে বেড়ান। কীট-পতঙ্গ, পাখপাখালি, আগাছা, অর্কিড—যা কিছু চোখে পড়ে তাই খুঁটিয়ে দেখেন। কৈশোরের সেই অবোধ সংগ্রাহক মনটি এখনও সজীব। ঘরে ফেরার পথে গ্রিনহাউসে ঢোকেন। যেসব পরীক্ষা চলছে সেগুলোর হিসেব নেন। দুপুরে খাবার পর বৈঠকখানায় সংবাদপত্র পড়েন, চিঠিপত্রের জবাব লেখেন। তিনটায় শোবার ঘরে বিশ্রাম। স্ত্রী তখন

উপন্যাস পড়ে শোনান। সরল মিলনান্ত কাহিনীই পছন্দ। বিকেলে আবার ভ্রমণ। ফিরে এসে লনে বসে বিশ্রাম। সন্ধ্যায় যৎসামান্য আহার। একটু পানীয়। স্ত্রী পিয়ানো বাজান। শুনতে শুনতে কখনও ঘুমিয়ে পড়েন, তবে অনিদ্রা ও ক্লান্তিতে ভোগেন প্রায়ই। এভাবেই দিন গুজরান।

'প্রজাতির উৎপত্তি' প্রকাশের আগেই বেরিয়েছে *প্রবাল প্রাচীর* (*Coral Reefs*, ১৮৪২), *আগ্নেয় দ্বীপ* (*Volcanic Island*, ১৮৪৪), *গবেষণার রোজনামচা* (*Journal of Researches*, ১৮৪৫), *দক্ষিণ আমেরিকার ভূতত্ত্ব নিরীক্ষা* (*Geological Observations on South America*, ১৮৪৬), *সিরিপিডা গ্রন্থাবলি* (*Cirripedes*, ১৮৫১, ১৮৫৪)। *'প্রজাতির উৎপত্তি'* গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে একেকটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার মালমশলা ছিল এবং এভাবেই অতঃপর প্রকাশিত হয়েছে *'অর্কিডের পতঙ্গ পরাগায়নের নানা কৌশল'* (*On the Various Contrivances by Which Orchids are Fertilised by Insects*, ১৮৬২), *লতানো উদ্ভিদের বিচলন ও স্বভাব* (*On the Movements and Habits of Climbing Plants*, ১৮৬৫), *গৃহপালনে পশু ও উদ্ভিদের নানা রূপান্তর* (*The Variations of Animals and Plants Under Domestication*, ১৮৬৮).

'প্রজাতির উৎপত্তি' প্রসঙ্গে ডারউইনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মানুষের উদ্ভব। ইতর প্রাণিকুল না-হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনেই উদ্ভূত হলো, কিন্তু মানুষ? মানুষের পূর্ব-পূর্বপুরুষ কোনো বানরসদৃশ জন্তু— এমন ভাবনা বড়ই কষ্টকর। তাই এ বিষয়ে একটি বই লেখা অতঃপর ডারউইনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিলো। তিনি এ কাজে হাত দেন ১৮৬৭ সালে। ইতিমধ্যে লায়েল প্রমাণ করেন যে, এইগ্রহে মানুষের বসবাসের মেয়াদ এক লক্ষ বছর। অর্থাৎ লক্ষাধিক বছর আগে এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিলো না, কথান্তরে পৃথিবীতে ছিলো কিছু নরসদৃশ প্রাণী, যারা তখনও পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে নি। হাক্সলিও তুলনামূলক শারীরস্থান ও মস্তিষ্কের গড়ন বিশ্লেষণের সাহায্যে জীবজগতে মানুষের অবস্থানকে সাধারণ প্রাণিকুলের আওতায় নামিয়ে আনেন। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। মূল প্রশ্নটি থেকেই যায় : মানুষের মতো বিস্ময়কর মানসিক ক্ষমতাধর একটি জীব কি প্রাকৃতিক-নির্বাচননির্ভর বিবর্তনের সৃষ্টি হতে পারে? মানুষের উৎপত্তির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপের সাবেকি প্রচেষ্টায় শেষাবধি যোগ দেন রবার্ট ওয়ালেসও। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাখ্যা অসম্ভব বলে তিনি ঘোষণা করেন। ডারউইন ক্ষুব্ধ, বিস্মিত হন।

'মানুষের উৎপত্তি' (*The Descent of Man*) বেরোয় ১৮৭১ সালে। এখানেও

প্রজাতি-গ্রন্থের সেই অকাট্য যুক্তিবিন্যাস, দুর্লঙ্ঘ্য তথ্য-প্রমাণ। দেহকাঠামোর বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য স্তন্যপায়ীর, বিশেষত বানরকুলের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা সহজদৃষ্ট। দেহকাঠামো, মস্তিষ্ক, ভ্রূণ, মেরুদণ্ড ইত্যাকার সাদৃশ্যের দরুনই তো শ্রেণীবিন্যাসবিদরা বহুকাল আগে মানুষকে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাঙের বর্গভুক্ত করেছেন আমাদের উৎপত্তি-রহস্য সম্পর্কে কিছু না-ভেবেই। মানুষ এমন এক স্তন্যপায়ী থেকে উদ্ভূত যার ছিল সুচলো কান ও একটি লেজ। এগুলো আজ মানব শরীর থেকে লোপ পেলেও আমাদের কানে ও মেরুদণ্ডপ্রান্তের কয়েকটি কশেরুকায় তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ রেখে গেছে। অত্যুন্নত মানুষের দেহকাঠামো অবশ্যই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি? ডারউইন বলেন, এটাতো নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই উদ্ভূত, বিকশিত। তিনি দেখান এই বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর ইতর প্রাণিকুলে অনুপস্থিত নয়। অনেক প্রাণীর মধ্যে, সামান্য মাত্রায় হলেও, কৌতূহল, বিস্ময়, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি ও যুক্তিবিন্যাস বিদ্যমান। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ডারউইনের স্বকালে আদিমানবের কোনো ফসিল আবিষ্কৃত হয় নি। জার্মানির নিয়ানডের্থালে পাওয়া (১৮৫৭) মানুষের করোটিখণ্ডকে তখন উদ্ভট বস্তুর বেশি আমল দেওয়া হয় নি। সুতরাং ডারউইনের পক্ষে সেই সময় মানুষের উৎপত্তির একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সহজ ছিল না। তবু তিনি সেই অসাধ্যসাধন করেন।

বইটি প্রকাশিত হলে আবারও কটু কথার ঝড় উঠবে—ডারউইনের এই আশঙ্কা কিন্তু এবার সত্য হয়ে ওঠে নি। *'প্রজাতির উৎপত্তি'* প্রকাশের পর এই ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা ছাড়া লায়েল (*Antiquity of Man,* ১৮৬৩) ও হাক্সলি (*Man's Place in Nature,* ১৮৬৩) স্ব-স্ব অবদানের মাধ্যমে বিবর্তন বিষয়ে পাঠকদের স্পর্শকাতরতা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ততোদিনে বিজ্ঞানী হিসেবে ডারউইনের ব্যাপক প্রতিষ্ঠাও সহায়ক হয়েছিলো। বিবর্তনবাদ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের এলাকা পেরিয়ে রাজনীতি, সমাজবিদ্যা ও দর্শনে তার দখল কায়েম করেছে। চক্ষুষ্মান্‌দের কাছে অতঃপর ডারউইনবাদের বহুমাত্রিক তাৎপর্য আর অস্পষ্ট নেই। তাই *'মানুষের উৎপত্তি'* সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় না-ওঠাই স্বাভাবিক ছিলো।

'মানুষের উৎপত্তি' সমাদৃত হওয়ার পর বিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিত ডারউইন অবসর নেওয়ার কথা ভাবেন : এখন বয়স ষাট, বার্ধক্য, তাই গভীর তত্ত্বীয় চিন্তাভাবনা বেমানান। কিন্তু কাজ বন্ধ হয় না। সত্তরে পৌঁছুবার আগেই আরও তিনটি বিজ্ঞানগ্রন্থ বেরোয় : *মানুষ ও জন্তুদের*

আবেগের বহিঃপ্রকাশ (*Expressions of Emotions in Man and Animals,* ১৮৭২), *'পতঙ্গভুক উদ্ভিদ'* (*Insectivorous Plants,* ১৮৭৫), *কেঁচো প্রসঙ্গ* (*The Formaton of Worms with Observations of Their Habits,* ১৮৮১) এই লহরীর প্রথম বইটি *'মানুষের উৎপত্তি'* গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের সম্প্রসারণ এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ কর্ম হিসেবে স্বীকৃত। ডারউইন রয়েল সোসাইটির সদস্যপদ (১৮৩৯) ও কপ্‌লে পদক (১৮৬৪) সহ বিশ্বের নানা সংস্থার পদক ও সম্মানিত ফেলো হওয়া সত্ত্বেও স্যার উপাধি পান নি, সম্ভবত রানী ভিক্টোরিয়া বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কখনই মনস্থির করতে পারেন নি বলে। শেষ জীবনে আত্মকথা লেখার বাসনা জাগে। লিখেও ফেলেন। স্মরণ করেন কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি, আপন কৌতূহল, স্ত্রী এমার সেবাযত্ন ও ভালোবাসা, সন্তানদের কথা, বন্ধু ও সহকর্মীদের সহৃদয়তা এবং নিজের নির্মোহ মূল্যায়ন। পুস্তিকাটির শেষ ক'টি পঙ্ক্তি : "একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমার সাফল্য, তা যতোটাই হোক, আমার মতে, এর মূলে আছে অনেকগুলো জটিল ও বহুমাত্রিক মানসিক গুণ ও পরিস্থিতি। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা—যে-কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার অন্তহীন ধৈর্য, তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহের অধ্যবসায় এবং উদ্ভাবনের ক্ষমতার সঙ্গে কিছুটা বোধশোধ। এমন মাঝারি ধরনের ক্ষমতা নিয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস কীভাবে টলিয়ে দিয়েছি, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।" বইটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি।

১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে এক বন্ধুর বাড়ির দরজায় তিনি হৃৎরোগে আক্রান্ত হন, জ্ঞান হারাতে হারাতে আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরের বছর এপ্রিল মাসে ডাউনে বড় ধরনের আক্রমণ ঘটে ও শয্যাশায়ী হন। দিন কয়েক ভালো থাকার পর ১৫ এপ্রিল খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ মূর্ছা যান। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরলে অস্ফুট স্বরে স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেন। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায়।

রাজকীয় সমারোহে ডারউইন সমাহিত হন লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে নিউটন ও লায়েলের পাশে। শবাধার বহন করেন হুকার, ওয়ালেস, হাক্সলি, রয়েল সোসাইটির সভাপতি স্পাটগউড প্রমুখ। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞানের একটি যুগের সমাপ্তি ঘটে—যে-যুগ ছিল বিপ্লবের, আলোড়নের, নব নব উদ্ভাবনে পুরনো জীর্ণ মূল্যবোধ ধসানোর। ডারউইন ছিলেন সেই যুগের শেষ অধিনায়ক।

প্রজাতির উৎপত্তি

শুরুতেই মনে রাখা প্রয়োজন, সরল আদিম জীব থেকে কালক্রমে জটিলতর উন্নততর জীবের উদ্ভবের ধারণা, যা জীববিবর্তনবাদ নামে পরিচিত, চার্ল্‌স্‌ ডারউইন মোটেই তার আবিষ্কারক নন, অন্যতম ব্যাখ্যাতা মাত্র। ডারউইনের পিতামহ এরেসমাস ডারউইন (১৭৩১-১৮০২), যিনি ডারউইন-পূর্ব বিবর্তনবাদের সর্বপ্রধান প্রবক্তা সেই জঁা লামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) সমসাময়িক, তিনিও বিবর্তনবাদী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। বিবর্তন চিন্তাসমৃদ্ধ তাঁর লেখা *'Organic Life'* কবিতাটির একাংশ এরূপ :

Organic life beneath the shoreless waves
Was born and nursed in Ocean's pearly caves ;
First forms minute, unseen by spheric glass,
Move on the mud, or pierce the watery mass ;
These, as successive generations bloom,
New powers acquire, and larger limbs assume ;
Where countless groups of vegetation spring,
And breathing realms of fin, and feet, and wing.

Thus the tall oak, the giant of the wood,
Which bears Britania's thunders on the flood;
The whale, unmeasured monster of the main,
The lordly lion, monarch of the plain,
The eagle soaring in the realms of air,
Whose eye undazzled drinks the solar glare,

Imparious man, who rules the bestial crowd,
of language, reason and refletion proud,
With brow erect who scorns this earthly sod,
And styles himself the image of his God ;
Arose from rudiments of form and sense,
An embryon point, or microscopic ens!

চার্ল্‌স্ ডারউইন তাঁর *Origin of Species* গ্রন্থের শুরুতেই An Historical Sketch অধ্যায়ে 'প্রজাতির উৎপত্তি' বিষয়ক ধারণার বিবর্তন সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা এঁকেছেন। তিনি অ্যারিস্টটলসহ অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকের আনুষঙ্গিক আধা-বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে বর্তমানকালে সরাসরি চলে এসে ফরাসি প্রত্নজীববিদ বুফোঁ (Georges Buffon, ১৭০৭-১৭৮৮) থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বুফোঁ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজাতির উৎপত্তি ব্যাখ্যার প্রয়াস পেলেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতামত এবং প্রজাতি উৎপত্তির মূল প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকার দরুন ডারউইন তাঁর ধারণাকেও আমল দেন নি। ডারউইন লামার্কের তত্ত্বকে অবশ্যই পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেন, কেননা এর আগে উল্লিখিত যাবতীয় বিবর্তন ব্যাখ্যার মধ্যে লামার্কবাদ ছিল সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক এবং এটি খণ্ডন ব্যতীত তাঁর পক্ষে এগুনো অসম্ভব হতো। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের স্থানীয় কিছু রোগের বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা ও তাতে শ্বেতাঙ্গদের প্রবণতা সম্পর্কে ১৮১৮ সালে ডা. উয়েল্‌স্‌কৃত বিশ্লেষণে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বীকৃতি লক্ষ্য করেন। অধিকন্তু জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান জন্মগত রকমফের আর নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নততর ফসল সৃষ্টিতে কৃষকদের সাফল্যও ডা. উয়েল্‌স্ লক্ষ্য করেন। উষ্ণমণ্ডলে কৃষ্ণাঙ্গ ও শীতপ্রধান এলাকায় শ্বেতাঙ্গদের একক আধিপত্য যে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল, তাতে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহ ছিলেন। অবশ্য তাঁর বিশ্লেষণ মানুষের বিভিন্ন জাতিগঠনের মধ্যে সীমিত ছিল, গোটা জীবজগতে প্রযুক্ত হয় নি। ১৮২৬ সালে প্রফেসর গ্রান্ট Edinburgh Philosophical Journal-এ তাঁর এই অদ্ব্যর্থ বিশ্বাস


জাঁ লামার্ক



বার্ডস অব প্যারাডাইস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ডারউইনের, প্রজাতির রূপান্তর বুঝতে সহায়ক হয়েছিল পুরুষ-পাখির আচরণ

ব্যক্ত করেন যে, প্রজাতি থেকেই প্রজাতির উদ্ভব (অর্থাৎ প্রজাতি দৈব সৃষ্ট নয়) এবং পরিবর্তনের মধ্যেই তাদের ক্রমোন্নতি। ১৮৩১ সালে পাট্রিক ম্যাথু লিখিত Naval Timber and Arboriculture প্রবন্ধে প্রজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যক্ত অভিমত ছিল পরবর্তীকালে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত ও সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত ডারউইন ও ওয়ালেসের প্রবন্ধগুলোর সিদ্ধান্তের অনুরূপ। তবে বিশ্লেষণ বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত ছিল এবং দুর্ভাগ্য-বশত লেখাটি কারও নজর কাড়ে নি। ১৮৪৪ সালে ছদ্মনামে লেখা '*Vestiges of Creation*' বইটি বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তাতে বিবর্তনে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও লেখক রক্ষণশীল মহলের দ্বারা অত্যন্ত নিন্দিত হন। ডারউইনের ভাষায়, "খুব কম নির্ভুল তথ্য ও বৈজ্ঞানিক সতর্কতার মারাত্মক বরখেলাপ সত্ত্বেও... এই ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, কুসংস্কার দূরীকরণ ও অনুরূপ মতবাদকে স্বাগত জানানোর ভূমি-নির্মাণে বইটি এদেশে চমৎকার কাজ করেছিল।" ১৮৫২ সালে হার্বার্ট স্পেনসর এক প্রবন্ধে বহু তথ্যপ্রমাণসহ প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা সমর্থন করেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান যে, জীববিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উনিশ শতকের শুরু থেকে প্রজাতির মতোই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে একটি স্থায়ী তত্ত্ব হয়ে উঠছিলো। এই কালপর্বে ভূবিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা, জীবভূগোল, অঙ্গসংস্থান ও শারীরস্থান, ভ্রূণতত্ত্ব, শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে, ম্যালথাস 'On population' নিবন্ধটি লেখেন (১৮২৬) এবং গ্রিগর ম্যান্ডেল বংশগতিবিদ্যার মূলসূত্রগুলো আবিষ্কার করেন (১৮৬৬)। আমরা জানি ম্যালথাসের ওই লেখাটি ডারউইনকে তাঁর তত্ত্বগ্রন্থনায় কতোটা সহায়তা যুগিয়েছিল এবং আরো জানি, যথাসময়ে ম্যান্ডেলের আবিষ্কারটি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ডারউইন আপন তত্ত্বটি পরিমার্জনার ও শুদ্ধতর করার সুযোগ পেতেন।



হার্বার্ট স্পেনসর

লামার্কের বিবর্তনবাদ *Philosophie Zoologique* প্রকাশিত হয়েছিল ডারউইনের জন্মবর্ষ ১৮০৯ সালে। বিবর্তনের প্রথম এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মর্মসার নিম্নরূপ : জীবজগতের বর্তমান রূপ দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের ফল। আমরা, মানুষেরা আসলে মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গরু অর্থাৎ জলচর, উভচর, সরীসৃপ

স্তরের মধ্য দিয়ে স্তন্যপায়ীতে পৌঁছে শেষে বানর পর্যায় পেরিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছি। কিন্তু কীভাবে? চাহিদার চাপে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রবল ইচ্ছের তাড়নায় ও এভাবে 'অর্জিত চারিত্র্যের বংশানুসৃতির' (inheritance of acquired characters) দৌলতে এবং প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের নিয়মে। জিরাফের সামনে উঁচু পা ও লম্বা গলার উৎপত্তির ব্যাখ্যা লামার্কবাদের অন্যতম ক্লাসিক দৃষ্টান্ত। জিরাফের পূর্বপুরুষরা একদা জেব্রার মতো ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবাসস্থলের ঘাস ও ঝোপঝাড় বিনষ্ট হলে ও গাছের পাতা একমাত্র আহার্য হয়ে উঠলে পাতা সংগ্রহের জন্য তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ও তারা উঁচু ডাল থেকে পাতা খাওয়ার ফলে তাদের সামনের পা ও গলা কিছু উঁচু হতে থাকে (ব্যায়ামে যেভাবে আমাদের পেশির বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে) এবং এই অর্জিত পরিবৃত্তি বংশান্তরিত হয়। এভাবে খাদ্যলাভের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না ঘটায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে হাজার হাজার বছরে জিরাফ বর্তমান দেহকাঠামো লাভ করেছে। এই কঠিন সংগ্রামে যারা সবচেয়ে সচেষ্ট, জেদি ও উদ্যমী তাদের সামনের পা ও গলা বেশি লম্বা হয়েছে, তারাই আহার্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, বেড়েছে আর নিশ্চেষ্ট অলসরা অনাহারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তৎকালীন ওই জিরাফের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছার, অর্থাৎ তাদের বিবর্তনের মূলে আছে পরিবেশের প্রবল চাপ, বাঁচার অদম্য ইচ্ছা, পা ও গলার অত্যধিক ব্যবহার ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তন এবং এই অর্জিত পরিবৃত্তির বংশানুসৃতি।

তুলনা হিসেবে জিরাফের বর্তমান প্রজাতি উৎপত্তির ডারউইনি ব্যাখ্যাটি উল্লেখ্য। প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে এক প্রজন্মে জিরাফের পা ও গলা কিছুটা লম্বা হলেও পরবর্তী প্রজন্মে এই উত্তরাধিকার বর্তায় না, যেভাবে ব্যায়ামপুষ্ট পিতামাতার সন্তানরা ব্যতিক্রমী না হয়ে সাধারণ শিশুর স্বাস্থ্য নিয়েই জন্মায়। রহস্যটি অন্যত্র। যে-কোনো জীবগোষ্ঠীর সবগুলো প্রাণী হুবহু অভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে নানা রকমফের থাকে— রঙে, গড়নে, স্বভাবে। এইসব বৈচিত্র্যের কোনোটি বাঁচার জন্য সুবিধাজনক হলে সেটির বিকাশ ঘটে। উল্লিখিত জিরাফদের সবার সামনের পা ও গলার দৈর্ঘ্য অবশ্যই সমান ছিলো না, সেখানে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক (যেমন একটি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে) আর এইসব বৈশিষ্ট্য জন্মগত ও বংশানুক্রমিক। তাই চরম খাদ্যাভাবজনিত প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে যাদের সামনের পা ও গলা সামান্য উঁচু তারা অন্যদের তুলনায় পাতাসংগ্রহে স্পষ্টতই সুবিধাভোগী ও ভাগ্যবান। বলাবাহুল্য, পরিস্থিতি না বদলানোর জন্য প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামে খাটো-গলা

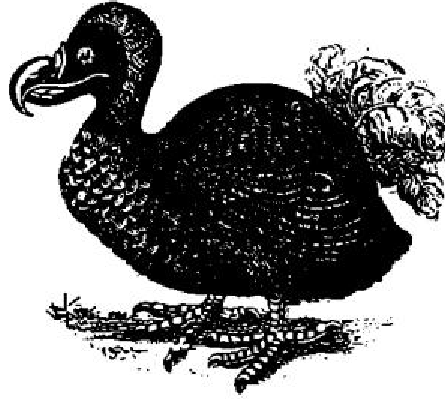
জিরাফেরা লোপ পেয়েছে ও লম্বা-গলা জিরাফ টিকে থেকেছে। এখানে চেষ্টা ও ইচ্ছার ভূমিকা শূন্য, জন্মসূত্রে পাওয়া পা ও গলার সামান্য উচ্চতাটুকুই আসল। এভাবে কিছুটা লম্বা-গলা জিরাফের একটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটেছে এবং তাদের মধ্যেও আবার গলা-দৈর্ঘ্যের জন্মগত তারতম্যের দরুন প্রতিযোগিতা অব্যাহত থেকেছে, খাটোরা ক্রমাগত লোপ পেয়েছে, উঁচুরা টিকে থেকেছে। প্রক্রিয়াটি হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে আর এই নির্বাচনে নতুন জাতের জিরাফ এসেছে। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং জন্মগত পরিবৃত্তির ওপর কার্যকর এই নির্বাচনই নতুন প্রজাতি উৎপত্তির চাবিকাঠি। তাই ডারউইনের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থটির পূর্ণ নাম *The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (প্রাকৃতিক নির্বাচন মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি বা জীবন-সংগ্রামে সুবিধাপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্থায়িত্ব)*।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূবিদ ও জীববিদরা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে, অর্থাৎ ঈশ্বরই পৃথিবী ও জীবজগতের স্রষ্টা এমন বিশ্বাসে বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাঁরা পৃথিবীর সঙ্ঘটিত যাবতীয় পরিবর্তনে হেতুর বদলে শুধু পরিবর্তনের ধরন ব্যাখ্যাই নিজেদের কর্তব্য ভাবতেন। কিন্তু ক্রমে এই বিশ্বাসে ফাটল ধরে। শিলারাশি থেকে পাওয়া পৃথিবীর ও ফসিল থেকে পাওয়া জীবজগতের ভিন্ন ইতিহাস বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের (৬০০০ বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি) বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং পৃথিবীর ও জীবজগতের বর্তমান রূপ যে-কোনো একটা শক্তির অল্পদিনের সৃষ্টি নয়, বহু শক্তির সুদীর্ঘকালীন জটিল বিক্রিয়ার ফল এমন একটি বস্তুবাদী ধারণা তাঁদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে।

তৎকালে ভূবিদদের দুটি দল ছিল: স্বতঃসিদ্ধবাদী (uniformitarian) ও প্রলয়বাদী (catastrophist)। প্রথম দলের মতে, পৃথিবী একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল সত্তা। বৃষ্টি, বাত্যা ও তুষার পর্বতকে ক্ষয় করে, নদীনালা স্থলভাগ লেহনক্রমে অন্যত্র পলি জমায়, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি ভূতল ভাঙে, ডোবায়, ওঁচায়। তাই স্থলভূমি, হ্রদ, পর্বত ও সমুদ্রের পরিবর্তন একটি লাগাতার ঘটনা। এর শুরু নেই, শেষ নেই। জীবজগতের ক্ষেত্রেও তাঁরা অনুরূপ বাস্তবতায় বিশ্বাসী। জীবের উদ্ভব ও লয় একটি নিয়মিত ঘটনা। তারা জন্মে, লড়াই করে, লড়াই অত্যধিক কঠিন হলে লোপ পায়, কখনও ফসিলে আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য রাখে। স্বতঃসিদ্ধবাদীরা জীববিবর্তনে অবিশ্বাসী ছিলেন, প্রাণ ও প্রজাতি সৃষ্টি সম্পর্কে নীরব থাকতেন। ডারউইনের জ্যেষ্ঠ বন্ধু, স্বতঃসিদ্ধবাদী চার্লস্ লায়েল (১৭৯৭-১৮৭৫) জীবজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জড়প্রকৃতি উভয়ের ভূমিকা

স্বীকার করলেও মানুষ যে এককভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাতে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

প্রলয়বাদীরা পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পৌছার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধারা দেখতেন। তাঁরা বাইবেল বর্ণিত পৃথিবী সৃষ্টির ছ'দিনের সময়সীমাকে প্রতীক ভাবতেন এবং প্রত্যেকটি দিনকে একটি যুগ ধরতেন। তাঁদের মতে, পৃথিবীর ইতিহাসের গোড়ার দিকে অনেকগুলো মহাপ্রলয় ঘটে— ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, প্লাবন। শেষ প্লাবনটি ঘটে নোহর আমলে, অতঃপর পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজিত। প্রলয়বাদীরা মনে করতেন যে, ঈশ্বর বারবার জীবজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করেছেন বলেই এক যুগের ফসিলের সঙ্গে অন্য যুগের ফসিলের এতোটা ফারাক। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের জীব-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল। ঈশ্বর উপযুক্ত পরিবেশের জন্য উপযুক্ত জীব সৃষ্টি করেন বলেই তো আদিম যুগে আদিম জীবজন্তু, অপেক্ষাকৃত উন্নততর পরিবেশে উন্নততর জীবজন্তুর বসবাস আর এজন্যই সর্বোন্নত পরিবেশের জন্য ঈশ্বরের সর্বশেষ সৃষ্টি মানুষ। ডারউইনের ভূবিদ্যার প্রথম শিক্ষক অ্যাডাম সেজউইক (১৭৮৫-১৮৭৩) ছিলেন প্রলয়বাদী এবং বিবর্তনের ঘোর বিরোধী। ডারউইনের জীববিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠার পরও তিনি কখনই কোনো আপস করেন নি এবং আমৃত্যু তাঁর ছাত্রের এই তত্ত্বকে ধিক্কার দিয়েছেন। সেই যুগের জীববিদরাও সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং ঈশ্বরসৃষ্ট প্রত্যেকটি প্রজাতিকে অপরিবর্তনশীল ভাবতেন। জীব-শ্রেণীবিন্যাসের পিতৃপুরুষ কেরলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) প্রজাতির অভ্যন্তরীণ নানা পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও প্রজাতির নিত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন। ডারউইনের উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক জন স্টিভেন্স্ হেনশ্লো (১৭৯৬-১৮৬১) কখনই সৃষ্টিতত্ত্বে আপন বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি, এমনকি লায়েলের মতো স্বতঃসিদ্ধবাদীর আপসপন্থী মতবাদকেও নাস্তিকতাদুষ্ট ভেবেছেন।

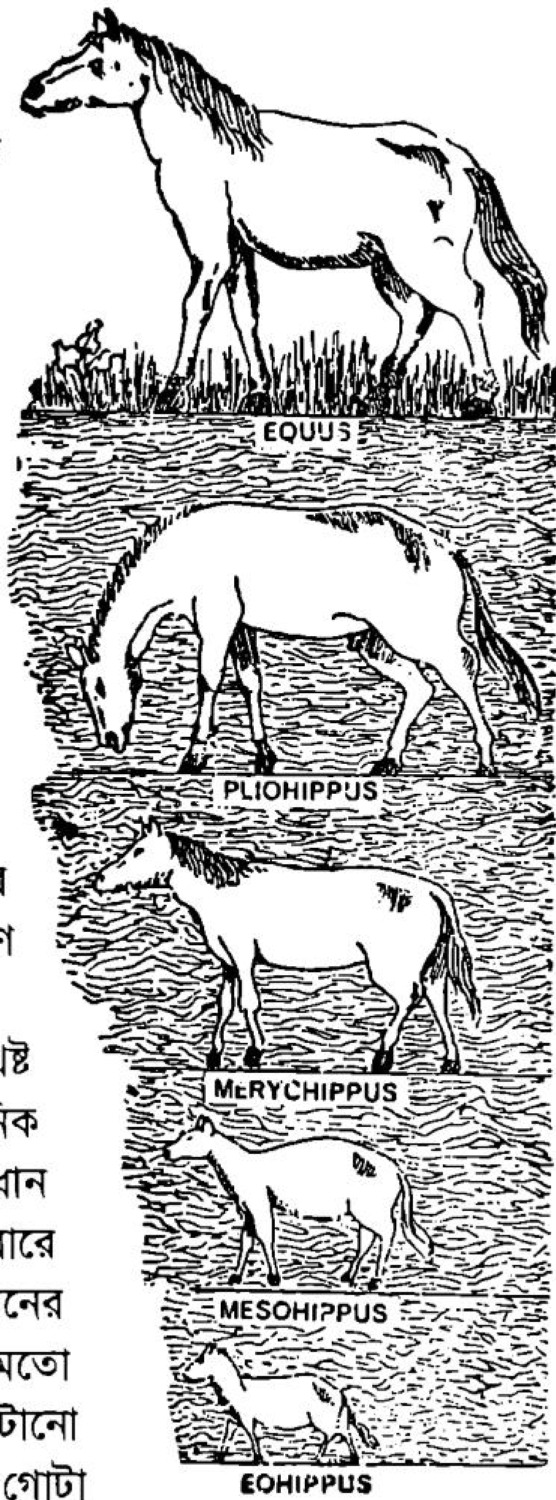


লুপ্ত প্রজাতির নজির ডোডো

না-ঐতিহ্য, না-শিক্ষাসূত্র কোনোভাবেই চার্ল্স্ ডারউইনের বিবর্তনবাদী হওয়ার কথা নয়। পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ। কৈশোরে পিতামহ এরেসমাস ডারউইনের *Zoonomia* (১৭৯০ সালে প্রকাশিত) পাঠ তাঁকে বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত করে নি। ছাত্রজীবনে এডিনবরায় ড. গ্রান্টের মুখে লামার্কবাদের

উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা তাঁর ওপর কোনোই প্রভাব ফেলে নি। আঠার শতকের শুরুতে উন্মেষিত প্রজাতির রূপান্তর সম্পর্কিত ভাবনাগুলো ডারউইনের যৌবনেও সৃষ্টিতত্ত্বের বালুকবলিত চিন্তাজগতের ফল্গুনদীতে শুধু অন্তর্বাহী অদৃশ্য ধারা হিসেবেই বহতা ছিল। ডারউইন সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেন নি। তিনি বিবর্তনবাদী হন 'বিগ্‌ল্' ভ্রমণের সময় জীবজগতের ভূবিস্তারণ লক্ষ্য করে, বিশেষভাবে গ্যালাপেগ্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন জাতের চড়ুই ও কচ্ছপের মধ্যে মিল ও অমিল আবিষ্কার করে। এভাবেই তিনি প্রলয়বাদী থেকে স্বতঃসিদ্ধবাদী ও শেষে বিবর্তনবাদী হয়ে ওঠেন এবং সত্যিকার নিয়ম ও দৈবের মধ্যে প্রথমটিকেই বরণ করেন।

কিন্তু বিবর্তনবাদী হওয়াটাই তো যথেষ্ট নয়, চাই বিবর্তন-ক্রিয়ার সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ডারউইন ইংল্যান্ডের কৃষিপ্রধান এলাকার কেন্দ্রস্থলে বড় হয়েছেন আর পরিবারে ছিল নানা জাতের প্রাণী পোষা ও প্রজননের পুরনো রেওয়াজ। তাই গৃহপালনে যে ইচ্ছামতো গাছপালা ও জীবজন্তুর নানা পরিবর্তন ঘটানো যায় এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকার দরুন গোটা জীবজগতে বিদ্যমান তদ্রূপ একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতাও আঁচ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। প্রজনবিদদের কর্মকাণ্ড তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, যারা পছন্দসই জীবজন্তু ও গাছপালার নানা প্রকারভেদ জন্মান, কেবল সেরা গরু-ভেড়া পোষেন, শুধুই ভালো ফল-ফসল ফলান, তাতে পশু বেশি লোমশ ও মাংসল হয়ে ওঠে, ফলমূল ও শাকসবজির স্বাদ বাড়ে। নির্বাচনের সাহায্যেই তাঁরা এই অসাধ্যসাধন করেন এবং তাও মাত্র কয়েক প্রজন্মে। ইউরোপীয় ও আরবি ঘোড়ার পার্থক্য সকলেই জানেন।



ঘোড়ার ক্রমবিবর্তন

ইউরোপীয়রা চেয়েছে মালবাহী ঘোড়া, আরবীয়রা দৌড়ের। প্রথমটি গাট্টাগোট্টা, জবুথবু। দ্বিতীয়টি চকচকে, নির্মেদ, ক্ষিপ্র। একই পূর্বপুরুষ থেকে এই দুই জাতের ঘোড়া সৃষ্টি কেবল নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এদের আজ আর কোনোই মধ্যবর্তী ধরন নেই, কেননা ওদের প্রজননের সুযোগ দেওয়া হয় নি, অবিরাম বাছাই চলেছে ঈপ্সিতদের, বর্জিত হয়েছে অন্যরা। এভাবেই সবগুলি মধ্যগ হারিয়ে তারা আজ দুটি স্বতন্ত্র জাতি। একটি গ্রে-হাউন্ড ও মিনি পুড্‌ল্ পাশাপাশি রাখলে কে বলবে তারা অভিন্ন পূর্বপুরুষের সন্তান। সাধারণ পায়রা ও নোটন পায়রার মধ্যকার পার্থক্য চোখ ধাঁধানোর মতো বৈকি! কিন্তু এই মানুষি নির্বাচনের কোনো বিকল্প প্রকৃতিতে থাকা সম্ভব কি? স্বয়ং প্রকৃতি কি কোনো নির্বাচক হতে পারে?

এই ভাবনায় আবিষ্ট থাকার সময় ডারউইন একদিন টমাস রবার্ট ম্যালথাসের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়েন এবং কিছুটা আকস্মিকভাবেই সমস্যা সমাধানের সূত্রটি খুঁজে পান। গুণোত্তর প্রগতিতে জনসংখ্যা ও সমান্তর প্রগতিতে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন জনসমাজে জায়মান জীবনসংগ্রাম যেভাবে লোকসংখ্যা সীমিত রাখে, তাঁর মনে হলো, প্রকৃতিতেও তেমনটি সম্ভব। মুহূর্তে জীবজগতের অন্যতম একটি ছবি তাঁর চোখে ফুটে উঠলো, যেখানে বিপুল হারে বর্ধমান উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে আহার ও বাসস্থান দখলের জন্য চলছে মরণপণ লড়াই, তাতে বেধড়ক মারা পড়ছে অসংখ্য জীব, বেঁচে থাকছে খুবই কম। জীবনসংগ্রাম এখানেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক।

জীবের বংশবৃদ্ধির অত্যধিক প্রবণতার দরুন বিপুলসংখ্যক সন্তান উৎপাদন সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না-ঘটার দৃষ্টান্ত অজস্র ও সহজদৃষ্ট। হাতিরা নব্বই বছর জীবদ্দশায় ছ'টির বেশি সন্তান প্রসব করে না। তাদের সবগুলো সন্তান বেঁচে রইলে ও এই জন্মহার প্রজন্মান্তরে অটুট থাকলে, ডারউইনের হিসেব মতো ৭৪০-৭৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে হাতির সংখ্যা দাঁড়াতো ১ কোটি ৯০ লক্ষ। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। বিশ্বখ্যাত শ্রেণীবিন্যাসবিদ কেরলাস লিনিয়াস দেখিয়েছেন যে, একটি বর্ষজীবী ওষধি মাত্র দুটি বীজ ফলালে ও তা থেকে দুটি চারা গজালে এবং প্রজন্মান্তরে অভিন্ন ঘটনা অব্যাহত থাকলে বিশ বছরে ওষধির সংখ্যা দাঁড়াবে দশ লক্ষ। অথচ বছরে মাত্র দুটি বীজ ফলায় এমন প্রজাতি পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য। একটি গাছ বছরে লক্ষ লক্ষ বীজ ছড়ায়। কিন্তু তাদের সংখ্যা তো তেমন বাড়ে না। একটি মাছের পেটে যে-পরিমাণ ডিম থাকে তার সামান্য অংশ থেকে জন্মানো সবগুলো পোনা বেঁচে থাকলে ও একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্ত হলে মাত্র কয়েক বছরে ওই এক জাতীয়

মাছেই পৃথিবীর তাবৎ জলাশয় ভরে উঠতো। এইসব দৃষ্টান্ত যৌক্তিক, কিন্তু প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা পরীক্ষালব্ধ নয়। ডারউইন স্বচক্ষেও এমন বহু নজির দেখেছেন। ইউরোপীয়রা আর্জেন্টিনায় বসতি স্থাপনের আগে সেখানে কোনো ঘোড়া ছিল না। ১৮৩২ সালে ডারউইন সেখানে অগণিত ঘোড়া দেখতে পান, যেগুলো ওইসব লোকের সঙ্গে আসা নগণ্যসংখ্যক ঘোড়াঘুড়ীরই বংশধর। কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি বিস্ময়কর। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ আমদানির ফলেও তাই ঘটেছিলো। শত্রুহীন পরিবেশে, অঢেল খাবার, কম মৃত্যুহার, নির্বিঘ্ন অবাধ বংশবিস্তারের সুযোগই এমন সংখ্যাবৃদ্ধির হেতু। দক্ষিণ আমেরিকায় ডারউইন জীবজন্তু সংগ্রহের সময় উটপাখি শিকার করেছেন এবং লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, পর্যাপ্ত ডিম পাড়া সত্ত্বেও ওদের তেমন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। ডারউইন ডাউনগাঁয়ে একদিন এক জায়গায় ইংলিশ অর্কিডের ২৪০৮০ বীজ গোণেন এবং হিসেব করেন যে এগুলোতে চারা গজালে ও প্রজন্মান্তরে তা পুনরাবৃত্ত হলে এই অর্কিড পৃথিবীতে একচ্ছত্র দখল কায়েম করতো। কিন্তু তা হয় না। টিকে থাকার প্রচণ্ড লড়াই এদের সংখ্যা একটা সীমানায় আটকে রাখে।

ম্যালথাসের সূত্র থেকে ডারউইন জীবজগতে অস্তিত্বের সংগ্রামের (struggle for existence) মতো একটি প্রবল পরাক্রান্ত প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। প্রক্রিয়াটি সহজদৃষ্ট হলেও, তাঁর মতে, তার বিস্তার ও গভীরতা সহজবোধ্য নয়। মনোরম শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে কাকলিমুখর পাখিদের দেখে আমরা অনায়াসেই ভুলে যাই যে তারা কীটপতঙ্গ ও ফলফলাদি খেয়ে বেঁচে থাকে, অর্থাৎ অবিরাম অন্য জীবন ধ্বংস করে চলে। আবার ওই পাখি এবং তাদের ছানাগুলো খাওয়ার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে শিকারি জীবজন্তুর দঙ্গল। অবশ্য অস্তিত্বের সংগ্রাম সর্বত্র রক্তারক্তির রূপলাভ করে না। মরুকিনারে দাঁড়ানো যে গুল্মটি, সে নীরবে লড়ে শুষ্কতার বিরুদ্ধে। একটি গাছ হাজার হাজার বীজ ছড়িয়েও একটি চারা বাঁচাতে পারছে না অন্যান্য আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, যারা ইতিমধ্যেই আশপাশের জমিতে পাকাপোক্ত দখল কায়েম করেছে। তা ছাড়া গজালেই কী? মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার জন্য আছে কীটপতঙ্গ, গরু-ছাগল। ধরা যাক, গাছের ডালে পরগাছার ঝোপ (loranthus sp.) রঙিন ফলের পসরা সাজিয়ে বসেছে পাখির আশায়, ওরাই তার বীজ ছড়াবে। কিন্তু বনে তো আরও গাছপালা আছে, তাদেরও রঙিন ও সুস্বাদু ফল আছে, তারাও পাখির মনকাড়ার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ এখানেও একই প্রতিযোগিতা। পরগাছার এক অদৃশ্য লড়াই চলছে অন্যান্য গাছের সঙ্গে।

ডারউইন খুব ছোট একটা জায়গায় একটা আনুষঙ্গিক পরীক্ষা চালান। এক

বসন্তে ২ × ৩ ফুট আয়তনের এক টুকরো জমি খুঁড়ে পরিষ্কার করে সেখানে রোজ তিনি গজানো আগাছার চারা গুণতেন। গোটা মরশুমে জন্মে ৩৫০টি চারা। অন্য আগাছার প্রতিযোগিতা না থাকলেও তাদের বাড়বাড়ন্ত ঘটে নি। ২৯৫টি মুড়িয়ে দিয়েছিলো খোলহীন শামুক আর ফড়িংরা। আগাছার টিকে থাকার এই লড়াইটি ছিলো খুবই তীব্র, তাতে মারা পড়েছিলো ৮৩ শতাংশই। তিনি আচষা একখণ্ড জমিতেও ১৫ রকমের বীজ বোনেন, যাতে এরি মধ্যে জাঁকিয়ে বসা আগাছার সঙ্গে লড়াই করে তারা গজায়। ১৫টি মাথা তুলেছিলো, কিন্তু বাঁচে নি একটিও। ডারউইনের আরেকটি পর্যবেক্ষণও উল্লেখযোগ্য। বাড়ির কাছে পুরনো বাথানে একটি ফার গাছ, পাশে খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে আটকানো, সেখানে অনেকগুলো কমবয়সী ফার চারা, যেন কারও লাগানো, কিন্তু বাইরে কোথাও একটিও চারা নেই। সব সাফসুতরো। ডারউইন ওই মাঠে ঘাসের আড়ালে নানা আকারের শত শত ফার চারার ধড় খুঁজে পান, ওগুলো মুড়িয়ে দিয়েছিলো গরু-ছাগলেরা, এক বর্গগজে গুণলেন ৩২, একটিও ঘাসের ওপর মাথা তুলতে পারে নি, কেটে দেখলেন একটিতে ২৬ বর্ষবলয়, অর্থাৎ সিকি-শতক বয়সী, মাটির সঙ্গে মিশে আছে ঘাসখোর জন্তুদের গোগ্রাসের চাপে। এই লড়াই না থাকলে গোটা মাঠ এতোদিনে ফার বন হয়ে উঠতো।

ডারউইন জীবজগতে আরেক ধরনের লড়াইও লক্ষ্য করেন। যেখানে কয়েকটি প্রজাতি একত্রে জীবন ও মৃত্যুর জালে বিজড়িত। একটি এলাকায় ক্লোভারের (এক ধরনের মেঠো আগাছা) বীজ হওয়া-না-হওয়া পরাগায়নে আসা ভোমরার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু ভোমরাদের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত মেঠো-ইঁদুরের সংখ্যা, কারণ তারা ভোমরার চাক নষ্ট করে ফেলে বলে তাদের সংখ্যাহানি ঘটে। কিন্তু আশপাশের গাঁয়ের গৃহস্থরা বেড়াল পুষলে তাতে ইঁদুরের সংখ্যা কমে। অতএব গোটা ছবি : গৃহস্থের ঘরে বেশি বেড়াল থাকলে মাঠের ইঁদুর কমে, তাতে ভোমরার সংখ্যা বাড়ে, ফলে ক্লোভার বেশি সংখ্যায় পরাগায়িত হয় ও অধিক বীজ ফলায়, মাঠে তখন অঢেল ক্লোভার ফলে এবং জমির উর্বরতা বাড়ে, কৃষকের কপাল খোলে, বেড়ালের খাবারের অভাব ঘটে না। ক্লোভার, ভোমরা, ইঁদুর ও বেড়ালের অস্তিত্ব ও সংগ্রামের এই ছবি জীবজগতের আন্তঃসম্পর্কের জটিলতার একটি দৃষ্টান্ত।

একই খাদ্য, অভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিদার একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে এই লড়াই অত্যন্ত তীব্র। একটি গাছের নিচে স্তূপীকৃত বীজ থেকে গজানো চারাদের মধ্যে মাটির সার ও সূর্যের আলোর জন্য চরম লড়াই বাধে। এখানে একের মৃত্যু অন্যের জীবনের আশ্বাস। এই কাড়াকাড়ি জীবজগতের সর্বত্র

সহজদৃষ্ট। স্কটল্যান্ডে মিশেল থ্রাস পাখির সংখ্যা বাড়লে গায়ক থ্রাসের সংখ্যা কমে। এশীয় ক্ষুদে আরসোলা রাশিয়ায় পৌঁছে স্থানীয় বড় জাতের আরসোলাদের খেদিয়ে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আমদানি করা মৌমাছিরা স্থানীয় বুনো মৌমাছিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। এক প্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতির, আবার একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই, আমরা জানি, জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং খাদ্য ও সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার জন্য ঘটে। এই সংগ্রামে জড়িয়ে আছে গোটা জীবজগৎ— স্থায়ী বাসিন্দা ও নবাগত হামলাকারী, বিজিত ও বিজয়ী, শিকার ও শিকারি। এতে বিপুলসংখ্যক জীবের মৃত্যু ঘটে, বেঁচে থাকে সামান্য কিছু। অস্তিত্বের এই ব্যাপক ও নিষ্ঠুর সংগ্রামে যারা বাঁচে, তারা দৈবক্রমে বেঁচে যায় না, বাঁচে এমন কিছু শারীরিক বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের দরুন, যা এই লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য অন্যদের তুলনায় তাদের কিছুটা সহায়তা যোগায়। এখানে চেষ্টা, ইচ্ছা ইত্যাদি লামার্কীয় ধারণা নিতান্তই নিরর্থক, অর্থবহ হলো জন্মগতভাবে পাওয়া কোনো বৈশিষ্ট্য— রং, পাতার খাঁজ, পাখনার দৈর্ঘ্য, লোমের ঘনত্ব ইত্যাদি। সবুজ রঙের পত্রভুক ফড়িংদের মধ্যে যার রঙ পাতার সঙ্গে যতো বেশি লাগসই তার পক্ষে পতঙ্গভুক প্রাণী পাখি-ব্যাঙ বা গিরগিটির চোখে পড়ার আশঙ্কা ততো কম, বেঁচে থেকে বংশবিস্তারের সম্ভাবনা ততো বেশি। গাছের বাকলভুক পতঙ্গের চিত্রবিচিত্র ধূসর রঙের ব্যাপারেও ওটা সত্যি। গাছপালার গায়ে বেশি কাঁটা বা লোম থাকলে কিংবা সেগুলো বেশি বিস্বাদ হলে তৃণভোজীদের হাত থেকে তাদের রক্ষালাভের সম্ভাবনা বাড়ে। যে ফুল যতো বেশি গন্ধভরা বা আকর্ষী পরাগায়িত হওয়ারও সম্ভাবনা তার ততো বেশি। এই যে সামান্য একটু বৈশিষ্ট্য সেটা সুতীব্র জীবনসংগ্রামে একটি জীবের টিকে থাকার সহায়ক হতে পারে, সে এরই দৌলতে অন্যদের হারিয়ে দিতে পারে, বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। পক্ষান্তরে ক্ষতিকর অর্থাৎ অস্তিত্বের সংগ্রামের পক্ষে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহকরা লড়াইয়ের শুরুতেই খতম হয়ে যায়। আপন বৈশিষ্ট্যগুলো বংশান্তরণের সুযোগই পায় না। অতঃপর সুস্পষ্ট যে এখানে কোনো বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার নির্ধারক প্রকৃতি স্বয়ং, সে-ই নির্বাচক, অনেকটা প্রজনবিদ মানুষের মতো। এভাবেই ডারউইন প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ্যকৃত কৃত্রিম নির্বাচনের একটি বিকল্প আবিষ্কার করেন। একেই তিনি বলেছেন প্রথমে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection), পরে হার্বার্ট স্পেনসরের (১৮২০-১৯০৩) পরিভাষা অনুসারে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (survival of the fittest).

ডারউইনের জীববিবর্তনতত্ত্বের ভিত্তি হলো তিনটি বাস্তবাবস্থা (facts) ও

দুটি অনুসিদ্ধান্ত (conclusion)। বাস্তবাবস্থাগুলো :

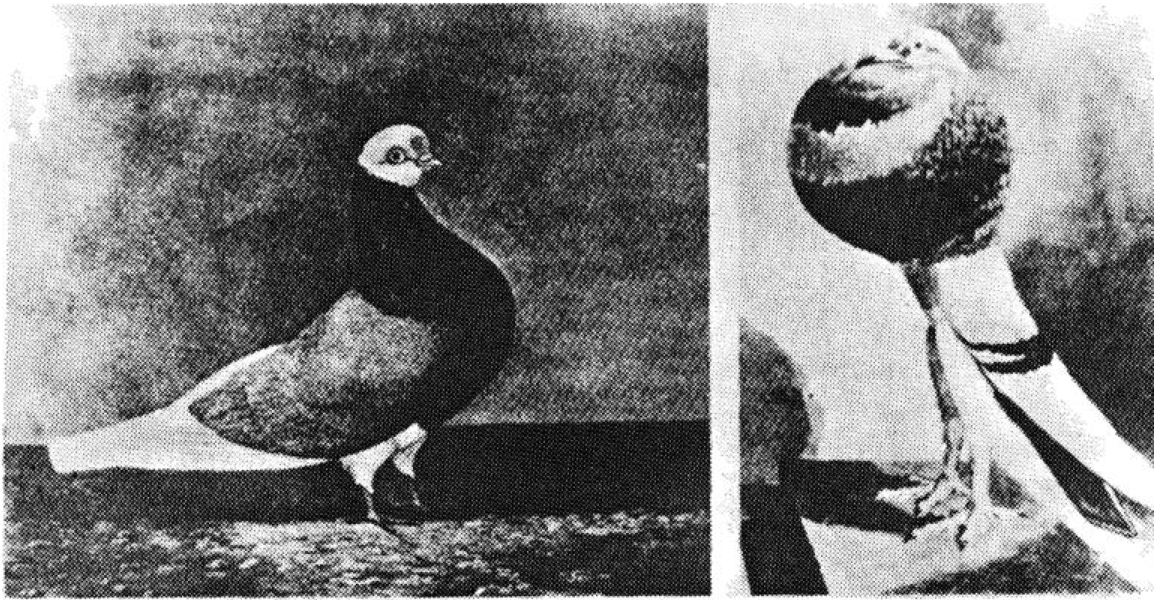
১. জীবের অত্যধিক বংশ বৃদ্ধির প্রবণতা, তাদের সংখ্যা বাড়ে গুণোত্তর প্রগতিতে অর্থাৎ ২,৪,৮,১৬ এই হারে ;
২. তা সত্ত্বেও প্রত্যেক প্রজাতির জীবসংখ্যা মোটামুটি একই থাকে;
৩. প্রজাতির সদস্যরা সামান্য হলেও পরস্পর থেকে কিছুটা পৃথক হয়। মানুষের মধ্যে একমাত্র যমজ ছাড়া এক পিতামাতার সন্তানরা কখনই সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়।

অনুসিদ্ধান্ত :

১. প্রথম দুই বাস্তবাবস্থা থেকে স্পষ্ট যে, জীবজগতে টিকে থাকার অর্থাৎ অস্তিত্বের একটি সংগ্রাম নিরন্তর বিদ্যমান এবং এই সংগ্রামই প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবসংখ্যা সীমিত রাখে ;
২. সংগ্রামে শুধু যোগ্যতমেরই জয় হয়, অযোগ্যরা লোপ পায়। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচন।

অস্তিত্বের সংগ্রামে কে যোগ্যতম, টিকে থাকার অধিকার কার? আমরা এখন জানি বংশসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের দৌলতে যে প্রকৃতির কাছে অন্যদের তুলনায় কিছুটা সুবিধাভোগী সে-ই অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকে, অন্যরা পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কেউ চিরকালীন যোগ্যতার সনদ পায় না। তাদের মধ্যে আবারও লড়াই শুরু হয়। বাছাই চলে, সংখ্যাগুরুর লুপ্তি ঘটে, সংখ্যালঘু টিকে থাকে। এই নির্বাচনের চাপের মুখে হাজার হাজার প্রজন্মে একটি প্রজাতি ক্রমাগত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে শেষাবধি আরো একটি নতুন প্রজাতি হয়ে ওঠে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জীবের জন্মলব্ধ পরিবৃত্তিগুলির (variations) ওপর কাজ করে প্রকৃতি, একটি নতুন প্রজাতি গড়ার ক্ষেত্রে এগুলোই তার কাঁচামাল, সে অনুকূল পরিবৃত্তিকে আমল দেয়, অনুপযোগীদের নাকচ করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন তাই জীববিবর্তনের চালিকাশক্তি।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁচামাল হিসেবে প্রকৃতির রাজ্যে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবৃত্তির অঢেল অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ডারউইনের কোনোই অসুবিধে হয় নি। 'বিগ্‌ল্' ভ্রমণে উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি দীর্ঘ বিশ বছর গোটা পৃথিবীর সিরিপিডার (এক ধরনের কবচি, যারা জাহাজ, জলমধ্য পাথর ও নানা আশ্রয় আঁকড়ে থাকে) শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে কাজ করার সময় একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের নানা পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হন। বিভিন্ন প্রজাতির অধস্তন বর্গ হিসেবে উপপ্রজাতি, ভ্যারাইটির অস্তিত্ব তো আসলে প্রজাতির নমনীয়তারই প্রকৃতিদত্ত প্রমাণ এবং পরিবৃত্তির সঞ্চয় ছাড়া তা



কৃত্রিম নির্বাচনের ফল পায়রা : একটি অন্যটি থেকে দৃশ্যত সম্পূর্ণ পৃথক, যেন দুটি প্রজাতি

অসম্ভব। অধিকন্তু তাঁকে সাহায্যের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা—হুকার, লায়েল, হাক্সলি, এ্যাসা গ্রে, ওয়াটসন প্রমুখ।

পরিবৃত্তির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থাকলেও এগুলোর ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থাপন সহজবোধ্য কারণেই অসম্ভব। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর, ক্ষেত্রবিশেষে হাজার হাজার বছর দীর্ঘ এবং তা অবলোকনের পক্ষে মানুষের পরমায়ু অত্যন্ত সীমিত। তাই বিবর্তনের বাস্তবতা পরোক্ষ প্রমাণ-নির্ভর এবং তেমন প্রমাণ ডারউইন কুড়িয়ে এনেছেন জীববিদ্যার যাবতীয় ভাণ্ডার খুঁড়ে এবং অঢেল পরিমাণে। কিন্তু সত্যি কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে? ডারউইন প্রদত্ত একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত এরূপ।

আবার সেই ক্লোভার আর ভোমরা। ধরা যাক হঠাৎ ভোমরা লোপ পেলো (অস্তিত্বের সংগ্রামে এমন লুপ্তি জীবজগতের সাধারণ ঘটনা) এবং তাতে পরাগায়নে ভোমরার ওপর সর্বৈব নির্ভরশীল ক্লোভারের বিলয়ও আসন্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্লোভার ঝোপের মধ্যে এমন দু'চারটি গাছ অবশ্যই থাকবে, যাদের ফুলের দলমণ্ডল একটু খাটো এবং খাটো শুঁড়অলা মৌমাছির পক্ষে তা থেকে মধু সংগ্রহ সম্ভব। এক্ষেত্রে শুধু ওই কয়েকটি ক্লোভারই ফলবন্ত হবে, বীজ ছড়াবে ও বেঁচে থাকবে। অন্যরা পরাগায়নের অভাবে বীজ-উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে লোপ পাবে। অতঃপর এই ধরনের ক্লোভারের নতুন প্রজন্মে বেশি সংখ্যায় খাটো দলঅলা গাছ জন্মাবে, মৌমাছিদের সঙ্গে তাদের নতুন ও স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং ক্রমে গোটা মাঠ কেবল ওই জাতীয় ক্লোভারে ভরে উঠবে। আবার আরেকটি সম্ভাবনাও আছে। ভোমরাবিহীন মাঠে আসা খাটো-শুঁড়ো

একই প্রজাতির (Biston betularia) দুই রঙের মথ (নিশিপ্রজাতি), মলিন পরিবেশে ধূসরটি অদৃশ্যপ্রায়, দাগফুটকি সাদাটি প্রকট, শত্রুর সহজ শিকার

মৌমাছির মধ্যে এমন কিছু মৌমাছি থাকা সম্ভব, যাদের শুঁড় ভোমরার মতোই লম্বা ও গড়নও কিছুটা আলাদা। এদের সামনে এখন নতুন সুযোগ। প্রতিদ্বন্দ্বী ভোমরা নেই, আছে অঢেল মধুভাণ্ড। সুতরাং তাদেরই রমরমা। সাধারণ মৌমাছিরা তখন তাদের কাছে হেরে যাবে, সামান্য লম্বা শুঁড়ের অনুকূল পরিবৃত্তির দৌলতে ওই অল্পসংখ্যক মাছি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করবে এবং কয়েক বছরের মধ্যে, পরিস্থিতি না বদলালে, মৌমাছির একটি নতুন জাত প্রতিষ্ঠা করবে। বহুদিন পর বিজ্ঞানীরা যখন খাটো দলমণ্ডলের ক্লোভার ও লম্বা শুঁড়অলা মৌমাছি খুঁজে পাবেন এবং তাদের জাতগোত্র শনাক্ত করতে বসবেন, তখন এদের নতুন প্রজাতি না হলেও উপপ্রজাতি বা ভ্যারাইটির মর্যাদা অবশ্যই দেবেন। গোটা ব্যাপারটাই কাল্পনিক কিন্তু এমন সম্ভাবনা মোটেই কাল্পনিক নয়। প্রজাতি থেকে ভ্যারাইটি, ভ্যারাইটি থেকে উপপ্রজাতি, শেষত একটি নতুন প্রজাতির উৎপত্তি অবশ্যই সম্ভব। অন্যথা একটি প্রজাতির মধ্যে প্রায়শই একাধিক ভ্যারাইটি থাকে কেন? প্রকৃতি যেখানে পরিবর্তনশীল, প্রজাতি সেখানে স্থবির হলে তার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। প্রজাতিতে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবৃত্তির উৎপত্তি তার গতিশীলতার লক্ষণ, অব্যাহত অস্তিত্বের শর্ত। প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যতীত কীভাবেই-বা নতুন ভ্যারাইটি জন্মায় ও টিকে থাকে?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি চাক্ষুষ দৃষ্টান্তও আছে। সম্ভবত একটিই। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে একটি মথের (Biston betularia)



গ্যালাপেগস্ দ্বীপপুঞ্জের তিন প্রজাতির কচ্ছপ : ভিনদেশজ প্রজাতিভবনের নজির

ধূসর ও শাদা দাগফুটকি দুটি ভ্যারাইটির মধ্যে শেষেরটির আধিক্য দেখা যেতো। ইংল্যান্ডের প্রকৃতি তখনও কলকারখানার ধুয়োর ঝুল-কালিতে মলিন হয়ে ওঠে নি, তাই ধূসর মথেরা সহজেই তাদের স্বাভাবিক শত্রু পাখি, টিকটিকি ইত্যাদির চোখে পড়তো, বংশ-বিস্তারের তেমন সুযোগ পেতো না। কিন্তু দাগফুটকি শাদা মথের জন্য পরিবেশটি ছিল আদর্শ—গাছের বাকল কিংবা তাতে গজানো লাইকেনের রঙের সঙ্গে মিলের দরুন তারা চমৎকারভাবে গা ঢাকা দিয়ে শত্রুদের নজর এড়াতে পারতো। বলা বাহুল্য, প্রকৃতি তাদেরই আনুকূল্য দিয়েছিল এবং ধূসর মথদের হটিয়ে তারা গোটা ইংল্যান্ডে আপন দখল কায়েম করেছিলো। কিন্তু শতাব্দীকালের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, কলকারখানার ধুঁয়ো শহর ও শিল্পাঞ্চলের আশপাশের এলাকাগুলিকে মলিন করে তোলে। এবার প্রকৃতির পক্ষপাত গেল ধূসর মথের দিকে, কেননা তার রঙটি আত্মরক্ষার অনুকূল। তাই তাদের এলাকা ভাগ হয়ে গেলো। শহরের আশপাশের কালিঝুলিমাখা এলাকা গেল ধূসরদের দখলে আর গ্রামাঞ্চলের পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির এলাকা পেলো শাদারা। মোটামুটি এই অবস্থা এখনও টিকে আছে, যদিও শাদাদের রাজ্যসীমা ক্রমেই বাড়ছে, কেননা কলকারখানায় কয়লার বদলে বিদ্যুৎ আসায় শহরের পরিবেশও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে এবং ধূসর মথেরা শত্রুর হাতে বেশি বেশি খতম হচ্ছে।

মনে রাখা প্রয়োজন ধূসর ও শাদা দাগফুটকি মথেরা একই প্রজাতিভুক্ত। তারা সবাই Biston betularia. প্রজাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্ব-প্রজনন (inbreeding), অর্থাৎ তারা অবাধে পরস্পরের সঙ্গে মিশে সন্তান উৎপাদন করতে পারে। তাতে রং বা অন্যান্য পার্থক্য বাধা হয়ে ওঠে না। আমাদের মথগুলি যেভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তার কোনো পরিবর্তন না ঘটলে এবং তাদের মধ্যে মেলামেশা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে প্রাকৃতিক নির্বাচনে শত শত বছরে তারা অবশ্যই পরস্পর থেকে আরও নানা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যে পৃথক হয়ে পড়তো, তাতে তাদের মধ্যে স্ব-প্রজনন বন্ধ হয়ে যেতো এবং তারা হয়তো-বা দুটো পৃথক প্রজাতিতেও বিভক্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু ইংল্যান্ডে তা



আর্কিয়প্টেরিসের জীবাশ্ম : সরীসৃপ ও পাখির সংযোগসূত্র। ডারউইনের এমন পূর্বাভাস ১৮৭৭ সালে সত্যায়িত হয়। পাওয়া জার্মানির ব্যাভেরিয়ায়।

ঘটে নি। কেননা এখানে এমন কঠোর অন্তরণ অসম্ভব। কিন্তু যেখানে সেটা ঘটেছে সেখানে নতুন প্রজাতি জন্মেছে বৈকি।

স্বতঃস্ফূর্ত পরিবৃত্তির উদ্ভব কিন্তু প্রজাতিভবনের (speciation) জন্য যথেষ্ট নয়। প্রজাতির সদস্যরা স্ব-প্রজননক্ষম বিধায় জন্মলব্ধ এইসব পরিবৃত্তি মিশ্রিত তরলিত হতে থাকে, কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পুঞ্জীভূত হতে পারে না, তাই তাতে নতুন প্রজাতির উদ্ভবও ঘটে না। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির জন্য তাই প্রজনন-প্রতিবন্ধ আবশ্যক। কিন্তু পাশাপাশি বসবাসে তা অসম্ভব। ভৌগোলিক অন্তরণ (geographical isolation) এই ধরনের প্রতিবন্ধ সৃষ্টির সহায়ক। ডারউইন গ্যালাপেগসের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির যেসব চড়ুই ও কচ্ছপ দেখেছিলেন, তাদের প্রজাতিভবনে ভৌগোলিক অন্তরণের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের প্রজাতিভবনকে ভিনদেশজ প্রজাতিভবন (allopatric speciation) বলে। একটি প্রজাতির সদস্যরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন অবস্থায় নতুন পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাস করলে পৃথক পৃথক পরিবেশের চাপে, নতুন নতুন অভিযোজনায় (adaptation) অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে বলে মাতৃপ্রজাতি ও ভ্রাতৃপ্রজাতি থেকে ক্রমেই আলাদা হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরের অচেনা হয়ে ওঠে। অতঃপর তাদের পাশাপাশি রাখলেও সাধারণত স্ব-প্রজনন ঘটে না, অর্থাৎ ততোদিনে তাদের মধ্যে প্রজনন-প্রতিবন্ধ পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। এভাবেই ভিনদেশজ প্রজাতিভবন ঘটে।

কিন্তু ডারউইন ভিনদেশজ প্রজাতিভবনকে প্রজাতি উৎপত্তির একমাত্র ধরন ভাবেন নি, বরং সমদেশজ প্রজাতিভবনকেই (sympatric speciation) অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি থেকে একটি প্রজাতির সদস্যদের পক্ষে বংশানুসৃত পরিবৃত্তির দৌলতে পৃথক পৃথক ধারায় বিকশিত হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়। স্ব-প্রজনন এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। কিন্তু একটি প্রজাতির একত্রবাসী সদস্যদের মধ্যেও প্রজনন প্রতিবন্ধ গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। ডারউইন বাস্তুসংস্থানিক

অন্তরণের কথা —'মরশুমি প্রচরণ', 'প্রজনন মরশুমের সামান্য রদবদল' ইত্যাদি সম্পর্কে ভেবেছেন। সব কুকুরই এক প্রজাতিভুক্ত। তারা স্ব-প্রজননক্ষম। কিন্তু একটি গ্রে-হাউন্ড ও একটি মিনি পুড্‌লের মধ্যে উচ্চতার তারতম্যের দরুন প্রজনন অসম্ভব। ইচ্ছে থাকলেও দেহকাঠামো এখানে বাধা। তেমনি বাধা হতে পারে রং, গলার স্বর, প্রজননাঙ্গের গড়নের সামান্য পরিবর্তন ইত্যাদির মতো পরিবৃত্তিজাত সাধারণ তারতম্য। এগুলির প্রভাবে একটি প্রজাতি বিভক্ত ও শাখায়িত হতে থাকে। তারা অবশ্যই ভ্যারাইটি হিসেবে মাতৃপ্রজাতির সঙ্গে সহাবস্থান করে। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে, অভিযোজনার চাপ বাড়লে, অস্তিত্বের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠলে, এইসব শাখার কোনোটির কোনো বৈশিষ্ট্য সুবিধাজনক হয়ে উঠলে কেবল সে-ই প্রকৃতির আনুকূল্য পাবে, তার বাড়বাড়ন্ত দেখা দেবে, অন্যরা দুর্লভ হয়ে উঠবে, এমন কি লোপ পেতেও পারে। তাই সমদেশজ প্রজাতিভবনও সম্ভব এবং সম্ভব বলেই দুনিয়াজোড়া লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে।



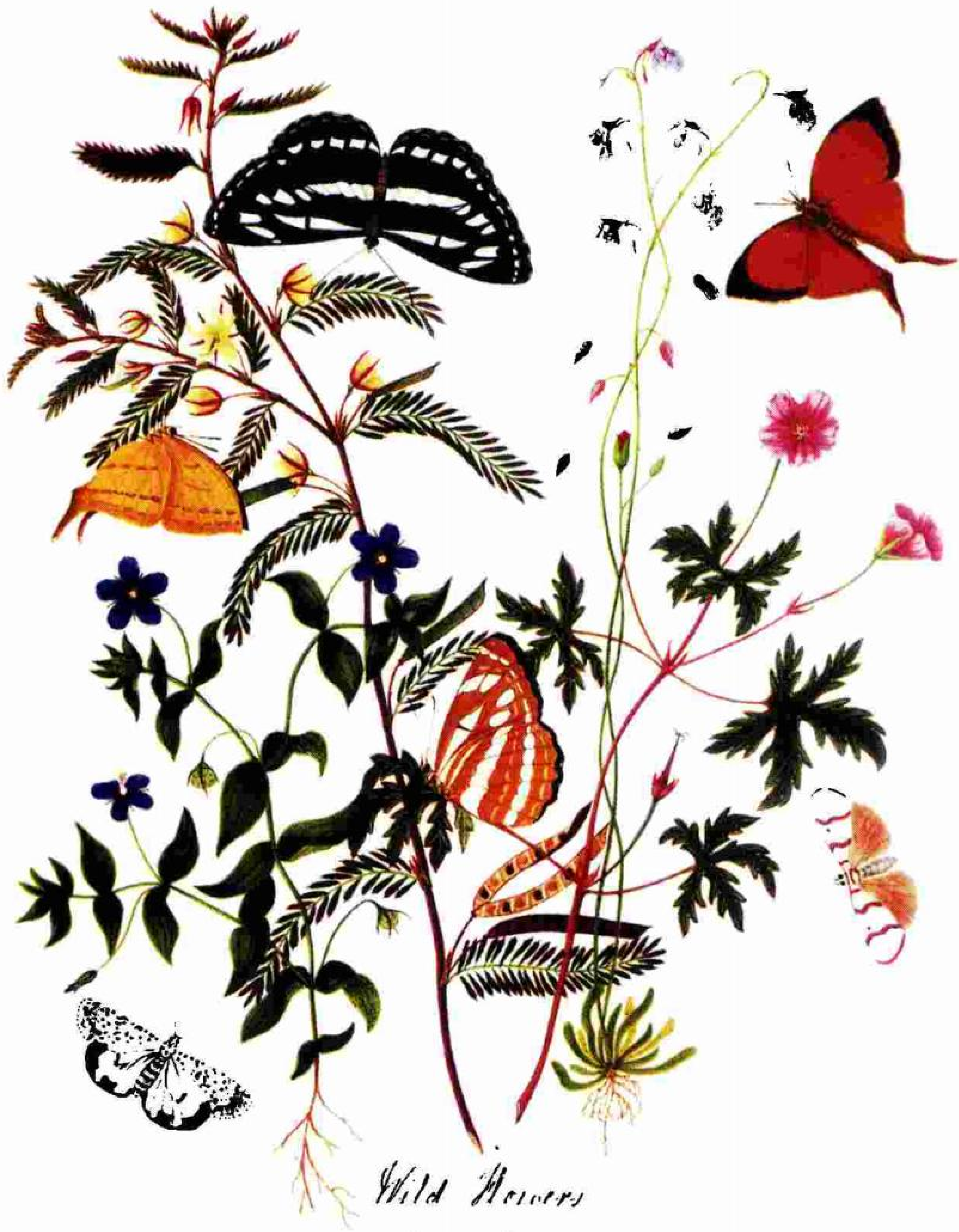
শিল্পীর দৃষ্টিতে আর্কিয়প্টেরিস

*'প্রজাতির উৎপত্তি'*র 'তত্ত্বের অসুবিধা' অধ্যায়ে ডারউইন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ধর্মবিদদের একটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন। চোখের মতো একটি অসাধারণ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি কি বিবর্তনের যান্ত্রিক নিয়মে সম্ভব? চোখের মতো কোমল প্রত্যঙ্গ শিলীভূত হওয়ার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভূতত্ত্ব থেকে কোনো সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিলো না। তিনি এজন্য বিবর্তনের ইতিহাস হাতড়ান নি, বিদ্যমান বর্তমান থেকেই উদ্ধার করেছেন তার জবাব। অনুদ্ভিন্ন চোখ থেকে অত্যন্ত জটিল চোখ পর্যন্ত বিকাশের একটি ক্রমবিন্যস্ত ধারা দেখানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। আজকের জীবন্ত প্রাণিকুলে, বিশেষত কেঁচো

থেকে পতঙ্গ পর্যন্ত চক্ষু-বিবর্তনে একেবারে অঙ্কুর থেকে সবগুলো অন্তর্বর্তী ধাপসহ পূর্ণাঙ্গ চোখের উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং চোখ দৈবসৃষ্ট এমন দাবি নাকচ করা ডারউইনের পক্ষে কঠিন হয় নি।

ভূতত্ত্ব ছিলো ডারউইনবাদের জন্য একাধারে সহায় ও সমস্যা। পৃথিবীর বয়স তৎকালীন বিজ্ঞানীদের হিসেবে ওল্ড টেস্টামেন্ট নির্ধারিত ৬ হাজার বছরের সময়সীমা বহুগুণ অতিক্রম করলেও তাতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অত্যন্ত মন্থর প্রক্রিয়ায় প্রজাতির উৎপত্তির সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিলো। ডারউইন নিজেই স্তন্যপায়ীর বিবর্তনের জন্য ৩০ কোটি বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। অথচ পদার্থবিদরা তখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ বয়স ধরেছিলেন মাত্র ১০ কোটি বছর। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের গতিবেগ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিলো। ওয়ালেস হিমযুগে অস্তিত্বের সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠছিল বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বেগ বৃদ্ধি ঘটে, এমন যুক্তি দেখান। ডারউইন আশ্রয় খোঁজেন লামার্কের 'অর্জিত পরিবৃত্তির বংশানুসৃতিতে'। আজ আমরা জানি পৃথিবী পাঁচ কোটি বছরেরও বেশি বয়েসী এবং প্রাণের উৎপত্তির পর পেরিয়েছে ৩০০ কোটি বছর, তাই জীববিবর্তনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আত্যন্তিক গতিবেগ নিষ্প্রয়োজন, লামার্কের অর্জিত পরিবৃত্তির বংশানুসৃতিও অত্যাবশ্যক নয়। পৃথিবীর ভূস্তরে বিন্যস্ত ফসিলে জীবগোষ্ঠীর কালানুক্রমিক ক্রমোন্নতির যে ছবিটি বিবৃত তা বিবর্তনের একটি অকাট্য প্রমাণ। একটি ভূস্তরে বিদ্যমান ফসিলরাশি অন্যতর দূরবর্তী ভূস্তরে অনুপস্থিত দেখে ডারউইন উৎফুল্ল হন। ঘটনাটি তাঁর ধারণার সঙ্গে অত্যন্ত লাগসই। অস্তিত্বের সংগ্রামে একটি প্রজাতির বিলোপ ঘটলে আর কখনই তার পুনরাবির্ভাব ঘটে না। আপতন-নির্ভর প্রাকৃতিক নির্বাচনের এটাই নিয়ম এবং তা লামার্কের 'পুনরাবির্ভাব প্রত্যয়ের' বিরোধী। লামার্ক লুপ্ত প্রজাতির পুনরাবির্ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কালক্রমে লুপ্ত ডোডা পাখি আবারও জন্মাবে ভাবতেন।

কিন্তু ফসিল-সাক্ষ্যের একটি বাস্তবাবস্থা ডারউইনকে বিচলিত করেছিলো। ৬০ কোটি বছর আগের কাব্রিয়ান যুগে বহু প্রজাতির প্রাণীর অঢেল প্রাচুর্য থাকলেও তারা প্রত্যেকেই সুসম্পূর্ণ, তাদের মধ্যে কোনোই অন্তর্বর্তী অসম্পূর্ণ প্রকারভেদ ছিলো না। এগুলো এমন নিটোল কেন? তবে কি প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে অকস্মাৎ, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে নয়? এমন ঘটনা তো ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাসী প্রলয়বাদীদের মতধারার অনুকূল। ডারউইন অবশ্য এজন্য ফসিল গঠনের সীমাবদ্ধতা ও প্রাপ্ত ফসিল সংখ্যার ন্যূনতাকে দায়ী করেন এবং কালক্রমে বিভিন্ন প্রাণিবর্গের অন্তর্বর্তী প্রকারভেদের (connecting link) ফসিল



বুনো ফুল ও প্রজাতি : চার্লস ডারউইনের নিবিড় অধ্যয়নের বিষয়

আবিষ্কারের পূর্বাভাস দেন। তিনি অভ্রান্ত ছিলেন। *'প্রজাতির উৎপত্তি'* প্রকাশের মাত্র আট বছর পর ১৮৭৭ সালে জার্মানির ব্যাভেরিয়ায় সরীসৃপ ও বিহঙ্গকুলের যোগসূত্র 'দাঁতাল পাখি' আর্কিয়প্টেরিসের ফসিল আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে মার্কিন প্রত্নজীববিদরা ঘোড়ার আদি পুরুষ ইয়োহিপ্পাস (কুকুরের আয়তন, সামনের পায়ে ৪ এবং পেছনের পায়ে ৩ আঙুল) থেকে এক-ক্ষুরে বিশালদেহী আধুনিক ঘোড়ার গোটা ক্রমবিবর্তন ফসিলের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

ফসিল-সাক্ষ্য, ভ্রূণতত্ত্ব ও ক্রমবিবর্তনের মধ্যকার সম্পর্ক ছিলো ডারউইনের অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক উদ্ঘাটন। অনেকগুলো ফসিলের জীবন্ত রূপের গড়ন যে বর্তমান প্রাণীদের ভ্রূণতুল্য, ডারউইন তা লক্ষ্য করেন। ভ্রূণাবস্থায় যে একটি প্রজাতি তার বিবর্তনের গোটা ইতিহাসের মুখ্য পর্যায়গুলো অতিক্রম করে, ডারউইন এই বাস্তবাবস্থাকে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে দেখান। পাখি ও মানুষের ভ্রূণ মাছ, ব্যাঙ ও টিকটিকির অপরিণত অবস্থার অনেকটা সদৃশ, কেননা পূর্বোক্তরা কালক্রমে শেষোক্তদের থেকেই বিবর্তিত হয়ে বর্তমান চেহারাটি পেয়েছে। এর অন্যতর আর কি ব্যাখ্যা সম্ভব? এই পর্যবেক্ষণ থেকেই জার্মান বিবর্তনবিদ আর্নেস্ট হেইকেল 'ব্যাষ্টিজনিতে জাতিজনির পুনরাবৃত্তি ঘটে' (ortogeny repeats phylogeny) এই ধারণাটি সূত্রবদ্ধ করেন।

টমাস হাক্সলিসহ ডারউইনের কোনো কোনো সমসাময়িক বিজ্ঞানী জীববিবর্তনে বিশ্বাসী থেকেও এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ার ফ্লেমিং জেঙ্কিন্স্ (১৮৬৭) বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সর্বার্থসাধক হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর উপস্থাপিত একটি কাল্পনিক উদাহরণ ডারউইনকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করেছিলো। একজন শ্বেতাঙ্গ জাহাজডুবির ফলে কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দ্বীপে আশ্রয় নিলে বর্ণ, কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি ইত্যাদি গুণের দরুন আত্যন্তিক নির্বাচনমূলক সুবিধাভোগী হওয়ায় বহু সন্তানের জনক হলেও কি শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপের মোট জনগোষ্ঠী এক সময় শ্বেতাঙ্গ হয়ে উঠবে? জেঙ্কিন্স্ বোঝাতে চেয়েছেন যে নতুন পরিবৃত্তিজাত চারিত্র্য যতো সুবিধাজনকই হোক, এক বা দুই প্রজন্মের মধ্যে অবাধ প্রজননের ফলে তা অবশ্যই তরলিত ও শেষাবধি বিলুপ্ত হবে। নির্বাচন তাতে দখল নেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় পাবে না। এই ধরনের সমালোচকদের সহজবুদ্ধিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের যেটুকু সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছিলো তা আসলে ডারউইনের তত্ত্বের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ অথচ তাঁর অজ্ঞাত একটি দিকের প্রতিই অঙুলি নির্দেশ করছিলো। এটি বংশানুসৃতিবিদ্যা। নতুন নতুন পরিবৃত্তি উদ্ভবের কারণ, এগুলোর প্রকৃতি ও জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসৃতির রহস্য

ডারউইনের সম্পূর্ণ অজানা ছিলো। অগত্যা পরিবৃত্তির সংখ্যা ও প্রগাঢ়তা বৃদ্ধির জন্য অধিক মাত্রায় তিনি লামার্কবাদের আশ্রয় নেন। কিন্তু তাতেও সুরাহা মেলে না। তাই জর্জ জ্যাকসন মিভার্ট প্রশ্ন তোলেন : 'এটা যদি এতোটাই ফলপ্রসূ তবে ইহুদিদের এখনো তাদের শিশুদের সুন্নত করতে হয় কেন?' আমরা চিন দেশে মেয়েদের পা ছোট করার জন্য লোহার জুতো ব্যবহারের কাহিনী জানি। শত শত বছর ধরে রেওয়াজটি চালু থাকা সত্ত্বেও সেখানে আজও সব মেয়েই স্বাভাবিক পা নিয়ে জন্মায়। জার্মান প্রাণিবিদ ভাইসমান (Weismann) বিশ প্রজন্ম ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে কেটে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে একটিও লেজহীন, এমন কি খাটো-লেজ ইঁদুরও জন্মাতে পারেন নি। বিশ প্রজন্ম লেজের অব্যবহার তাদের বংশগতিতে কোনোই প্রভাব ফেলে নি।

যাঁরা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাঁদের সকলের মতো ডারউইনও আপন জটিল তত্ত্বের সবগুলো উপাঙ্গকে সমপর্যায়ের পরিপক্বতা দিতে পারেন নি। পরিবৃত্তি সমস্যা তাঁকে আমৃত্যু চিন্তাক্লিষ্ট রেখেছিলো এবং এই প্রহেলিকা তাঁকে লামার্কবাদের দিকে তাড়িত করেছিলো। এসব সত্ত্বেও ডারউইনবাদ মানবচিন্তার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। এই তত্ত্বের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের দায় উত্তরসুরিদের এবং তাঁরা সেই কর্তব্য পালন করে চলেছেন। ডারউইনবাদের সঙ্গে আধুনিক বংশানুসৃতি-বিদ্যার সংশ্লেষ ঘটছে। ফলত, এই তত্ত্বের কোনো কোনো উপাঙ্গের পরিবর্তন ঘটছে আর তাতে জীববিবর্তনবাদ দুর্বল হওয়ার বদলে আরো শক্তিশালী, আরো সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। যাঁরা ডারউইনবাদের বিরোধী তাঁরা আজো এই তত্ত্বের কোনো বিকল্প দাঁড় করাতে পারেন নি, বরং বিবর্তনকে দৈবশক্তির আওতাধীন করার অপচেষ্টায় মদদ দিয়ে যাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

গ্রন্থে উল্লিখিত প্রধান
বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অ্যারিস্টটল
(খৃস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)
জন্ম ম্যাসিডনিয়ার স্টাগিরা। পিতা মহাবীর আলেকজান্ডারের পিতামহের চিকিৎসক। খৃস্টপূর্ব ৩৬৭ সালে এথেন্স যাত্রা, প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও একত্রে সতের বছর বসবাস। খৃস্টপূর্ব ৩৪৩ সালে দেশে ফেরা ও আলেকজান্ডারের শিক্ষকত্ব গ্রহণ। ন'বছর পর (৩৩৪) ছাত্র বিশ্বজয়ে বেরোলে আবার এথেন্সে ফেরা এবং জনৈক বন্ধু-রাজন্যের আনুকূল্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এখানে বারো বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা।

অ্যারিস্টটল সর্বকালের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত। একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, নীতিশাস্ত্রবিদ, তর্কবিদ্যাবিশারদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ, সাহিত্যবেত্তা, নন্দনতাত্ত্বিক এবং একই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের একাধিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা। খৃস্টপূর্ব ৩২৩ সালে আশ্রয়দাতার মৃত্যুর পর এই ভাবনা থেকে এথেন্স ত্যাগ করেন যে পাছে শহরটি সক্রেটিস হত্যার পর আরেক পণ্ডিত হত্যায় কলঙ্কিত হয়। ইউসুইয়া শহরে বাকি জীবন কাটান শান্তিতে।

উইলবারফোর্স, স্যামুয়েল
(১৮০৫-১৮৭৩)
জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর। পিতা উইলিয়াম উইলবারফোর্স ইংল্যান্ডের চার্চের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। স্যামুয়েল পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং অক্সফোর্ডের বিশপ হন (১৮৪৫-৬৯)। থিওলজিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫)। পরে উইনচেস্টারের বিশপ।

এডোয়ার্ড্‌স্‌, উইলিয়ম হেনরি
(১৮২২-১৯০৯)
মার্কিন নিসর্গী। ১৮৪৬ সালে আমাজন নদীর অববাহিকা সফর করেন। উল্লেখ্য গ্রন্থ *A Voyage up the River Amazon.*

ওয়ালেস, আলফ্রেড রবার্ট
(১৮২৩-১৯১৩)

জন্ম ওয়েল্স্-এর এক গণ্ডগ্রামে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান নি, স্কুল শেষও সম্ভব হয় নি। কৈশোরেই জীবনসংগ্রাম শুরু। জরিপের কাজে শিক্ষানবিসির সময় ভূতত্ত্বে হাতেখড়ি এবং পরে লায়েলের *'প্রিন্সিপ্যল অব জিওলজি'* পড়ে এই বিদ্যায় জ্ঞানবৃদ্ধি। বই পড়ার অদম্য নেশা ছিল, তাই অল্প বয়সেই পড়ে ফেলেন হামবোল্ডের *Personal Travel in South America*, *ম্যালথাসের An Essay on the Principles of Population*, রবার্ট চ্যাম্বার্সের *Vestiges of Natural History of Creation* ইত্যাদি। উইলিয়াম হেনরি এডোয়ার্ড্সের *The voyage up the River Amazon* পড়েই আমাজন অঞ্চলের গাছপালা ও জীবজন্তু সংগ্রহে যাওয়ার নেশা ধরে। যানও সেখানে, থাকেন প্রায় চার বছর (১৮৪৮-১৮৫২), কিন্তু বিপুল সংগ্রহ নিয়ে ফেরার পথে জাহাজে আগুন লাগে, সবকিছু পুড়ে যায়। কোনোক্রমে বেঁচে যান আরোহীরা। সুতরাং যেটুকু সচ্ছলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাও অঙ্কুরেই লোপ পেল। আবার কষ্টের সংসার। কিন্তু বেশিদিন গৃহবাস সহ্য হলো না। এবার গেলেন মালয়েশিয়া, থাকলেন আট বছর (১৮৫৪-১৮৬২)। জীবজন্তু সংগ্রহের অবসরে নিজের পর্যবেক্ষণ নিয়ে লেখালেখিও চলছিল। ডারউইনের সঙ্গে এই সূত্রেই যোগাযোগ। ১৮৫৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন ওয়ালেস—*On the Tendency of the varieties to Depart Indefinitely from the original Type* এবং পাঠান ডারউইনের কাছে। এতে বিবৃত ছিল জীববিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণার নির্যাস তথা ডারউইনের বিবর্তন বিষয়ক দীর্ঘ গবেষণার সারমর্ম। ফলত তাঁর নামও যুক্ত হয় বিবর্তনবাদের সঙ্গে। আধুনিক জীববিবর্তনবাদের অন্য নাম ডারউইন-ওয়ালেস থিয়োরি। ওয়ালেস কিন্তু এসব কিছুই জানতেন না। তাই দেশে ফিরে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে তাঁর মতো অখ্যাত লোক নিজের অজ্ঞাতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে গেছেন।

ওয়ালেস নব্বই বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর উল্লেখ্য রচনাবলি : *Geographical Distribution of Animals* (১৮৭৬), *Tropical Nature and other Essays* (১৮৭৮), *The Malayan Archipelago* (১৮৭৯), *Island Life* (১৮৮০), *Miracles and Modern Spiritualis* (১৯৮১), *Land Nationalisation* (১৮৮২), *The Wonderful Century* (১৮৯৯), *Man's place in the Universe* (১৯০৩), *My Life* (১৯০৫), *Social Environment and Moral Progress* (১৯১২)

শুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও কৌতূহলী ছিলেন; তাই লিখেছেন ভ্রমণকাহিনী, আত্মজীবনী, সমাজদর্শন এবং ধর্ম সম্পর্কেও। দরিদ্র ছিলেন, তাই কোনদিন ভুলেন নি দরিদ্রজনকে, লিখেছেন তাদের জন্যও। ওয়ালেস ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, প্রকৃতিপ্রেমিক তথা প্রকৃতির দার্শনিকও।

ওয়েন, রিচার্ড

(১৮০১-১৯০২)

জন্ম ল্যাঙ্কাশায়ারে ২০ জুলাই। শিক্ষা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্মজীবন শুরু লন্ডনের রয়েল কলেজ অব সার্জন্‌স্-এর জাদুঘরে, পরে অধ্যক্ষ। ১৮৫৬ সালে বৃটিশ মিউজিয়মের ন্যাচারাল হিস্ট্রি বিভাগের অধীক্ষক। ১৮৩৬ সাল থেকেই তুলনামূলক শারীরস্থান (anatomy) বিষয়ে হান্টারিয়ন প্রফেসর এবং এই বিজ্ঞান শাখায় বিশ্বখ্যাত। মৃত্যু ১৮ ডিসেম্বর লন্ডনে।

কার্লাইল, রিচ্‌মন্ড

(১৭৯০-১৮৪৩)

জন্ম আশবার্টন, ৮ ডিসেম্বর। টমাস পেইনের ভাবশিষ্য ও তাঁর ভাবধারার প্রচারক। দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটে ও সেখানে বসে গ্রন্থরচনা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার অক্লান্ত যোদ্ধা। ইংল্যান্ডে মুক্তচিন্তা প্রচারের জন্য অবিস্মরণীয়। মৃত্যু লন্ডনে, ১০ ফেব্রুয়ারি।

চেম্বার্স, রবার্ট

(১৮০২-১৮৭১)

জন্ম স্কটল্যান্ডের পেবল্‌স্ শহরে, ১০ জুলাই। ষোল বছর বয়স পুরান বই বিক্রি থেকে কর্মজীবন শুরু। পরে প্রকাশক ও লেখক। বিশটির বেশি ইতিহাসগ্রন্থ রচয়িতা (১৮২২-৩২)। Chambers Journal পত্রিকার সম্পাদক। ছদ্মনামে *Vestiges of Natural History of Creation* (১৮৪৪) লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মৃত্যু সেন্ট অ্যানড্রুস শহরে, ১৭ মার্চ।

ডারউইন, এরেসমাস

(১৭৩১-১৮০২)

চার্ল্‌স্ ডারউইনের পিতামহ। জন্মস্থান ইংল্যান্ডের এলস্টন শহর। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ এবং এডিনবরা মেডিকেল স্কুলের স্নাতক। চিকিৎসায় জমাট পসার ছিল, কিন্তু মনটি ছিল বিজ্ঞানীর, কবির, দার্শনিকের। *Zoonomia* (১৭৯৬) তাঁর বিবর্তনবাদমূলক গ্রন্থ, ব্যাখ্যা লামার্কের ঘনিষ্ঠ। লামার্কের সমসাময়িক হলেও তাঁদের তত্ত্ব আসলে সমান্তরাল ঘটনা। চার্ল্‌স্ ডারউইন পরবর্তীকালে জীববিবর্তনে যে-দুটি বিষয়ের গুরুত্ব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন সেই দুটি—'যৌন নির্বাচন' ও 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'—এরেসমাসও অবহিত ছিলেন। ইংরেজ কবি কোলরিজ এরেসমাসের বিবর্তনবাদকে 'ওরাং-ওটাং' তত্ত্ব বলে বিদ্রূপ করতেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববদিত পণ্ডিত জ্যাঁক রুশোর বন্ধু। পৌত্র চার্ল্‌স্ ডারউইন আত্মজীবনীতে এভাবে পিতামহের মূল্যায়ন করেছেন : "তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ছিল এরেসমাসের প্রতিভার উৎস। যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান, উদ্ভাবন সংযোজন ও সাধারণীকরণের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ...মানসবৈশিষ্ট্যে তিনি দার্শনিক। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ

ক্ষমতা, বহু বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অফুরান কর্মশক্তি ও উদ্যমে তিনি তুলনারহিত।' মৃত্যু ইংল্যান্ডের ব্রড্সল শহরে।

ডারউইন, রবার্ট

(১৭৬৬-১৮৪৮)

এরেসমাসের পুত্র, বিখ্যাত চার্লস্ ডারউইনের পিতা। অত্যন্ত সচ্ছল পরিবারের সন্তান। এডিনবরা থেকে চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক, পিতার মতোই খ্যাতিমান চিকিৎসক। বসবাস শ্রুস্বেরি শহরে। স্ত্রী বিখ্যাত চীনামাটির বাসন নির্মাতা ওয়েজউড পরিবারের মেয়ে সুসানা। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইন তাঁদের পঞ্চম সন্তান। ১৮১৭ সালে সুসানা মারা গেলে রবার্ট আর বিয়ে করেন নি। তিনি ছিলেন বিশালদেহী— ৬-২´ লম্বা, ওজন ৩৫০ পাউন্ড। চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনো ঝোঁক ছিল না। মৃত্যু শ্রুস্বেরিতে।

ফিট্স্রয়, রবার্ট

(১৮০৫-১৮৬৫)

জন্ম ৭ জুলাই। নৌ-অফিসার, জললেখাবিদ (hydrographer), আবহবিদ। রাজকীয় নৌবাহিনীতে প্রবেশ ১৮১৯, বিগ্‌ল্ জাহাজের ক্যাপ্টেন ১৮২৮ সালে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল জরিপ ((১৮৩১-১৮৩৬) করেন এবং ডারউইন তাঁর সঙ্গী ছিলেন। দুই খণ্ডে বিগ্‌ল্ ভ্রমণের পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন ১৮২৬, ১৮৩৬ সালে। ১৮৪১ সালে পার্লামেন্টের সদস্য। ১৮৪৩ সালে নিউজিল্যান্ডের গভর্নর। স্থানীয় অধিবাসী মাওরিদের ভূমির অধিকার সমর্থনের জন্য চাকুরিচ্যুত (১৮৪৫) ও ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন। ১৮৫০ সালে অবসর গ্রহণ। অতঃপর আবহ-সংক্রান্ত গবেষণায় নিবিষ্ট। *The Weather Book* প্রকাশিত ১৮৬৩ সালে।

দু'বছর পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজ হাতে গলা কেটে আত্মহত্যা।

বুফোঁ, জর্জ লুই

(১৭০৭-১৭৮৮)

ফরাসি প্রকৃতিবিদ ও দার্শনিক। আইনশাস্ত্রের স্নাতক, কিন্তু তা চর্চা করেন নি। কৃষি ও পদার্থবিদ্যায় নিবন্ধ লিখে বিজ্ঞানে প্রবেশ। ইংল্যান্ড ভ্রমণে নিউটনের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর কিছু রচনার ফরাসি অনুবাদক। গণিতেও আকর্ষণ ছিল। ১৭৩৯ সালে পঞ্চদশ লুই কর্তৃক রাজকীয় উদ্যান ও জাদুঘরের পরিচালক নিযুক্ত। অতঃপর বাকি জীবন কাটে জীববিজ্ঞানে। সহযোগীদের সাহায্যে রচনা করে ৩৬ খণ্ডের Natural History (১৭৪৯-৮৯)। এই গ্রন্থলহরীর একখণ্ডে সন্নিবিষ্ট (১৭৭৪) জীব বিবর্তন বিষয়ক তাঁর ধারণা— প্রাণিজগতের অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের স্বীকৃতি।

ভাইসম্যান, অগস্ট

(১৮৩৪-১৯১৪)

জার্মান জীববিজ্ঞানী, বংশগতিবিদ। তিনিই প্রথম কোষবস্তুকে *germplasm* (বংশগতির বাহক) ও *Somatoplasm* (দেহবস্তু) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি বহু পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে জার্মপ্লাজম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি : *Theory of Descent*, ২ খণ্ডে (১৮৮২), *Germplasm—a Theory of Heredity* (১৮৯৩), *The Evolution Theory*, ২ খণ্ডে, (১৯০৪)।

ম্যালথাস, টমাস রবার্ট

(১৭৬৬-১৮৩৪)

স্যারে অঞ্চলের ডরকিং শহরে জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি। গৃহশিক্ষকের অধীনে প্রাথমিক পড়াশোনা, পরে ক্যামব্রিজের জেসাস কলেজে। গ্রামের গির্জায় পাদ্রি হিসেবে কর্মজীবন শুরু। অচিরেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে আকৃষ্ট এবং আজীবন তাতেই নিবিষ্ট থাকেন। *Essay on the Principles Population* (১৭৯৮) রচনার জন্য স্বনামখ্যাত ও সমালোচিত। ১৭৯৯ সালে স্কান্ডিনেভিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স সফর শেষে দেশে ফিরে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যা তত্ত্বটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করেন (১৮০৩)। কিছুদিন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে অধ্যাপনা করেন ও কয়েকটি বইও লেখেন। মৃত্যু হেলিবেরি শহরে, ২৩ ডিসেম্বর।

মিভার্ট, জর্জ জ্যাকসন

(১৮২৭-১৯০০)

জন্ম ৩০ নভেম্বর, শিক্ষা হ্যারো ও লন্ডনের কিংস্ কলেজে। যাজক ও আইনজীবীর পেশা পেরিয়ে শেষে বিজ্ঞানী। ১৮৬২ সালে সেন্ট মেরি হাসপাতালে শারীরস্থানের অধ্যাপক। অতঃপর রয়েল সোসাইটির ফেলো (১৮৬৯) ও লিনিয়ান সমিতির সম্পাদক (১৮৭৪-৮০)। প্রাণিবিদ্যায় খ্যাতিলাভ এবং ডারউইন ও হাক্সলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। শেষ বয়সে দর্শনচর্চা এবং ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য গির্জা থেকে বহিষ্কৃত। উল্লেখ্য গ্রন্থাবলি : *Genesis of Species* (১৮৭১), *Man and Apes* ((১৮৭৩), *The Cat* (১৮৮১), *Nature and Thousut* (১৮৮২), *The Origin of Human Reason* (১৮৮৯)। মৃত্যু ১ এপ্রিল।

মেকলে, টমাস

(১৮০০-১৮৫৯)

জন্ম ইংল্যান্ডের রথ্‌লে টেম্প্‌ল্, ২৫ অক্টোবর। সচ্ছল পরিবারের সন্তান। ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে নামি ছাত্র। গণিত ছাড়া সকল বিষয়ে অসাধারণ চৌকস। আমৃত্যু অনন্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ছেলেবেলায় ইতিহাস রচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব। মিলটনের ওপর প্রবন্ধ লিখে প্রথম খ্যাতি। কিছুদিন আইন ব্যবসার পর রাজনীতিতে যোগদান। ১৮৩০ সালে পার্লামেন্টের সদস্য। বিখ্যাত বাগ্মী। ১৮৩৪ সালে ভারত বিষয়ক

উপদেষ্টা। তাঁর উদ্যোগেই ভারতে উচ্চশিক্ষায় ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি। চার বছর ভারত থাকেন ও দণ্ডবিধি প্রণয়নে অবদান রাখেন। কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থ রচয়িতা। মৃত্যু লন্ডনে, ২৮ ডিসেম্বর।

মেন্ডেল, যোহান গ্রিগর
(১৮২২-১৮৮৪)

জন্ম চেকোস্লাভাকিয়ার ব্রুন শহরে। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। কলেজে পড়ার সময় বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা গেলে পরিবারে দারুণ অর্থসঙ্কট দেখা দেয়। মেন্ডেল টিউসনি করতেন, বোনের কাছ থেকেও কিছুটা সাহায্য পেতেন। কিন্তু বোনের বিয়ে হলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষে গির্জায় যাজক (১৮৪৯) হন। সেখানকার পরিবেশ ছিল জ্ঞানচর্চার অনুকূল। ব্রাদারসের অনেকেই ছিলেন প্রকৃতিবিদ, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ। ধর্মীয় দায়িত্বের সঙ্গে তাঁরা অধ্যাপনাও করতেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন আর জাদুঘর গড়তেন। মেন্ডেলও শিক্ষকতায় যোগ দেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে গণিত পড়াতেন। অবসর সময় উচ্চতর ডিগ্রির জন্য গণিত ও পদার্থবিদ্যা চর্চা করতেন। পরে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি পান।

ভিয়েনা থেকে ফিরে আবার শিক্ষকতা শুরু করেন এবং তখনই মটরশুঁটির বংশানুসৃতি নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত। গির্জায় ফুলের বাগান ছিল এবং পাদ্রিরা বাগান করতেন। মটরশুঁটিতে বেগুনি ও সাদা ফুল ফোটে, ওদের কোনো কোনোটির গাছ লম্বা, আবার বেঁটেও আছে। তিনি ওদের মধ্যে সঙ্করণ ঘটিয়ে ফুলের রঙ ও গাছের দৈর্ঘ্যের বংশোত্তরণের নিয়ম খুঁজতে থাকেন। গণিতদক্ষ এই পর্যবেক্ষক এদের বংশানুসৃতিকে গণিতের নিয়মে বাঁধতে গিয়ে সর্বপ্রথম এ-বিষয়ের কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এভাবেই লেখেন *Experiment in Plant-Hybridization* নিবন্ধ। ১৮৬৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মেন্ডেল তত্ত্বটি ব্রুনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে পড়েন, কিন্তু গণিত-কণ্টকিত এই নিবন্ধ কারও বোধগম্য হয় না। অতঃপর লেখাটি পাঠান ১৮৬৬-র ৩১ ডিসেম্বর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক কার্ল্ ফন নেগেলির কাছে। তিনিও এই আবিষ্কারের তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হন। উদ্ভিদবিদ্যায় গণিতের প্রয়োগ তাঁর ভালো লাগে নি। অথচ মেন্ডেলই সর্বপ্রথম উদ্ভিদবিদ্যায় পরিসংখ্যানের অনুপ্রবেশ ঘটান, যার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। মেন্ডেল মারা যান ১৮৮৪-র ৬ জানুয়ারি। তিনি যে আধুনিক বংশানুবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা এই সত্য তাঁর জীবদ্দশায় স্বীকৃতি পায় নি।

মেন্ডেলের মৃত্যুর পর এই ধারার অনেক গবেষকের নিবন্ধেই তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রগুলো প্রভাব ফেলে। অবশ্য প্রায় কেউই তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। শুধু স্বনামখ্যাত হুগো ডেভ্রিস ১৯০০ সালে তাঁর এক নিবন্ধের পাদটীকায় লিখেছিলেন : "মেন্ডেলের মূল্যবান লেখাটা কারও নজর কাড়ে নি। তবে ওই লেখাপড়ার আগেই আমার এই গবেষণা শেষ হয়েছে। তাই এতে ওর প্রভাব পড়েছে তা বলা যাবে না। সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরো আমার নিজস্ব।"

ব্রুনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির কার্যবিবরণীতে ১৮৬৫ সালে মেন্ডেলের

এক্সপেরিমেন্ট ইন প্লান্ট হাইব্রিডাইজেশন প্রকাশের ৩৪ বছর পর তাঁর তত্ত্ব অসামান্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি পায় এবং তিনি নিউটন ও ডারউইনের সমপর্যায়ের বিজ্ঞানী হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মেন্ডেলের দুটি উল্লেখ্য কৃতিত্ব : ১. তিনি উদ্ভিদের একেকটি চারিত্র্য নিয়ে কাজ করেছেন যেজন্য তাঁর পরীক্ষা স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও অধিকতর শুদ্ধ হতে পেরেছে।

২. জীবদেহে প্রতিটি চারিত্র্যসৃষ্টির জন্য অপরিহার্য উপাদানের (এখন জিন বা বংশাণু) দ্বিগুণসংখ্যক ও জননকোষে একসংখ্যক উপস্থিতি। স্মতর্ব্য, তখনও কোষবিভাজন অনাবিষ্কৃত। গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো স্বকালের তুলনায় রীতিমতো বিস্ময়কর।

লামার্ক, জাঁন বাপ্‌তেস্ত

(১৭৪৪-১৮২৯)

জন্ম ১ আগস্ট ফ্রান্সে। দরিদ্র সন্তান, কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ। লামার্ক ছিলেন শুরুতে উদ্ভিদবিদ, লেখেন ৩ খণ্ডে *Florae francise,* রাজকীয় উদ্ভিদবিদের পদলাভ (১৭৮১)। ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরে অমেরুদণ্ডী প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। ৭ খণ্ডে *Natural History of Investibrate* (১৮১৫-২২)। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, *Philosophie Zoologique,* ২ খণ্ডে (১৮০৯)। গোটা জীবন দারিদ্রের মধ্যে কাটে। শেষ দশ বছর অন্ধ ছিলেন। মৃত্যু ১৮ ডিসেম্বর।

লায়েল, চার্লস্‌

(১৭৯৭-১৮৭৫)

জন্ম স্কটল্যান্ডের কিনর্ডি, ১৪ নভেম্বর, সুশিক্ষিত জমিদার পরিবার। স্কুল শিক্ষা নিউ ফরেস্ট অঞ্চলে, ওখানেই প্রকৃতি নিরীক্ষার শুরু। নানা জাতের গাছগাছড়া ও কীটপতঙ্গ সংগ্রহ এবং বই থেকে ওগুলি শনাক্তিতে নেশা ধরেছিল ছেলেবেলা থেকেই। এই সময় রবার্ট বেইকওয়েলের *Introduction to Geology* পড়েই প্রথম আকৃষ্ট হন ভূবিদ্যায়। অতঃপর একটি চিন্তা অনুক্ষণ তাড়া করে ফেরে—পৃথিবীর বয়স কতো? এভাবেই উদ্ভিদবিদ্যা ও পতঙ্গতত্ত্ব ছেড়ে নিবিষ্ট হন ভূতত্ত্বে। অক্সফোর্ডের স্নাতক (১৮১৯)। স্বভাবতই ঘনিষ্ঠ হন ওখানকার ভূতত্ত্বের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক উইলিয়ম ব্যাকল্যান্ডের সঙ্গে, সৌখিন ভূবিদ ডাক্তার গিডিয়ন মান্টিলের সঙ্গে। আইনশাস্ত্র পড়লেও আইনবিদ হন নি, হলেন ভূবিদ। লিখলেন ভূতত্ত্বের তিনটি বই—*Principles of Geology 1, 2, 3* (১৮৩০-৩৩)। এই সুবাদে আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াই ১৮৩১ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক। ব্যাকল্যান্ডের শিষ্য হলেও তাঁর প্রলয়বাদ তত্ত্বের (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটেছে বড় বড় কতকগুলি পরিবর্তনে) বদলে গ্রহণ করেন স্বতঃসিদ্ধবাদ (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে)। ভূবিদ হিসেবে ফসিলের বিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকলেও শুরুতে জীবের ক্রমবিবর্তন অস্বীকার করতেন।

পরে ডারউইনের প্রভাবে জীববিবর্তনের বাস্তবতা মেনে নেন, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তন অস্বীকার করে বসেন। তাঁর লেখা *Antiquity of Man* (১৮৬৩) বইতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।

ভূতত্ত্বে তাঁর অবদান : ১. সমকালীন কুসংস্কার থেকে ভূতত্ত্বের মুক্তিদান। অনুমানের বদলে পরীক্ষা ছিল যাবতীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তি; ২. অদ্যাবধি বিদ্যমান ভূসংক্ষোভ, ভূক্ষয় ও ভূ-আক্ষেপের মতো নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার নিরিখে ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যা; ৩. আল্পস্ পর্বতের বিষম ফসিলপুষ্ট স্তরগুলি যে ভূসংক্ষোভের ফল এই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত; ৪. পৃথিবীর জলবায়ুর মৌলিক পরিবর্তনের মূলে স্থলভাগ ও জলভাগের বিন্যাসের ভূমিকা আবিষ্কার; ৫. শিলা-বিসরণে জলস্রোতের বদলে হিমবাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। মৃত্যু লন্ডনে, ২২ ফেব্রুয়ারি।

সিডনি, স্মিথ

(১৭৭১-১৮৪৫)

জন্ম ৩ জুন। অক্সফোর্ডের স্নাতক। যাজক (১৭৯৪)। *Edinburg Review* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮০২)। ধর্মপ্রচারক, বক্তা ও প্রাবন্ধিক। মৃত্যু ২২ ফেব্রুয়ারি।

সেজ্উইক, অ্যাডাম

(১৭৮৫-১৮৭৩)

জন্ম ইয়র্কশায়ারে ২২ মার্চ। শিক্ষা ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। প্রাণিবিদ। ভূতত্ত্ব পাঠ্য বিষয় না-থাকা সত্ত্বেও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই বিষয়ে অধ্যাপকের পদ লাভ। দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও ভূতত্ত্ব সন্ধান অভিযান ও পড়াশোনায় অচিরেই পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করেন ও দ্রুত খ্যাতি লাভ ঘটে। ভূতত্ত্ব সমিতির সভাপতি (১৮০১) ছাড়াও বহু উচ্চপদ ও পদকে ভূষিত। পুরাজীবীয় শিলা বিশেষজ্ঞ। মৃত্যু ২৭ জানুয়ারি।

স্পেন্সর, হার্বার্ট

(১৮২০-১৯০৩)

জন্ম ডার্বি শহরে, ২৭ এপ্রিল। গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত। কর্মজীবন শুরু বাস্তু প্রকৌশলী হিসেবে (১৮৩৭-৪৬)। পরে *The Economist* পত্রিকার সম্পাদক (১৮৪৮-৫৩)। প্রথম উল্লেখ্য রচনা *Social Statics* (১৮৫০) বইটির বিষয়বস্তু—প্রগতির বিবর্তন। অতঃপর *Principles of Psychology* (১৮৫৫)। বইটিতে তিনি মনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারনা প্রয়োগ করেন। বিবর্তনের ধারণাকে একটি সার্বিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণের পর জীবন, মন ও সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং এই বীক্ষণ থেকে *System of Synthetic Philosophy* রচনার সূত্রপাত। দীর্ঘ ছত্রিশ বছরে সম্পূর্ণ ১০ খণ্ডের এই গ্রন্থাবলিতে আছে জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্রসহ বিবিধ বিষয়। তিনি আরও লিখেছেন—*শিক্ষা, মানুষ বনাম রাষ্ট্র* ইত্যাদি বই।

১৮৫৫ সালে স্নায়ুভঙ্গ ঘটে এবং অচল হয়ে পড়েন। মৃত্যু ব্রাইটন শহরে, ৮ ডিসেম্বর।

হাইকেল, আর্নেস্ট হেনরিখ

(১৮৩৪-১৯১৯)

জার্মান জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ভ্রূণের বিবর্তনে যে একটি জীবের বিবর্তনের গোটা ইতিহাস বিধৃত *(Ontogeny repeats Phylogeny)*—এই পর্যবেক্ষণের জন্য স্বনামখ্যাত। ডারউইনবাদের সমর্থক ও ইউরোপে এই তত্ত্ব প্রচারে উল্লেখ্য ভূমিকা। জীবদেহের অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে তাঁর মৌলিক অবদান অদ্যাবধি আদৃত।

হাক্সলি, টমাস হেনরি

(১৮২৫-১৮৯৫)

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। জন্ম লন্ডনের লাগোয়া ইলিং শহরে। অর্থকষ্টে দশ বছর বয়সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ ও স্বশিক্ষা শুরু। অবিরাম বই পড়া চলতো, কখনও সারারাত এবং নানান বই—ভূবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, দর্শন। পনের বছর বয়সেই সংশয়বাদী। কিছুদিন ফার্মেসিতে সহকারীর কাজ। উদ্ভিদবিদ্যার এক রচনা প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যের সূচনা—চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার বৃত্তিলাভ। স্নাতক হন স্বর্ণপদক পেয়ে। জাহাজে সার্জনের চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাত্রা। এই সময় অনেক সামুদ্রিক জীবজন্তু ব্যবচ্ছেদ ও প্রাণিবিদ্যায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ। দেশে ফিরে লায়েল, হুকার, হার্বার্ট স্পেনসর ও শেষে ডারউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সখ্য। ফসিল নিয়ে কাজ শুরু এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলো। সেকালে চাকরির দুর্দিন এবং গরিবদের জন্য আরও বেশি। শেষে অনেক কষ্টে প্রত্নজীববিদ্যার অধ্যাপক হন।

বিজ্ঞান থেকে কুসংস্কার হটানো ছিল হাক্সলির জীবন-লক্ষ্য। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ডারউইনবাদের পক্ষ সমর্থন ও বিতর্কে তাঁর কাছে বিশপ উইলবারফোর্সের হার ইংল্যান্ডের সমাজেতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা (৩০ জুন, ১৮৬০)। বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন, জিওলজিক্যাল সোসাইটি, রয়েল সোসাইটির সভাপতি হন। ইংল্যান্ডের শিক্ষা সংস্কারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষা পুনর্গঠনে মূল্যবান অবদান রাখেন। ১৮৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রিত ও সংবর্ধিত হন। উল্লেখ্য রচনা : *Man's Place in Nature* (১৮৬৩), *Vertibrate Anatomy* (১৮৭১), *Elementary Biology* (১৮৭৫), Invertibrate Anatomy (১৮৭৭), Physiology (১৮৭৭)

ডারউইনের ভাষায় তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে হাক্সলিই সর্বাধিক প্রতিভাবান, মনটি বিদ্যুৎশিখার মতো ক্ষিপ্র ও ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণধার। মৃত্যু লন্ডনে, ২৯ জুন।

হামবোল্ড, আলেকজান্ডার ফন

(১৭৬৯-১৮৫৯)

জন্ম ১৮ সেপ্টেম্বর। জার্মান বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানক। জার্মানির গটেনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা, বিষয় প্রত্নতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, দর্শন। সেখানে বিশ্বপর্যটক ক্যাপ্টেন কুকের সহযাত্রী জর্জ ফরস্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ (১৭৮৯)। অতঃপর উদ্ভিদবিদ্যা ও

বিশ্বভ্রমণে আগ্রহ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খনিবিদ্যায় ডিগ্রি নেন এবং কিছুদিন খনি পরিদর্শকের কাজ করেন। এই সময় জীবতত্ত্ব (Natural history) নিয়ে পড়াশোনা। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থপ্রাপ্তি এবং দক্ষিণ আমেরিকায় সফরযাত্রা এবং কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, মেক্সিকো ও পেরু ভ্রমণ (১৭৯৯-১৮০৪)। উদ্ভিদের ৬০ হাজার নমুনা সংগ্রহ ছাড়াও প্রাণিজগৎ, জলবায়ু, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। প্যারিসে বসবাস এবং অনুসন্ধান বিষয়ে ২৩ খণ্ডের গ্রন্থাবলি রচনা (১৮০৪-১৮২৭)। বার্লিনে প্রত্যাবর্তন (১৮২৭), রাশিয়ায় যাত্রা এবং উরাল ও সাইবেরিয়া সফর। শ্রেষ্ঠ রচনা ৫ খণ্ডে *Kosmos* : ১ম খণ্ড- মহাবিশ্ব, ২য় খণ্ড প্রকৃতি, ৩য় খণ্ড জ্যোতির্বিদ্যা, ৪র্থ খণ্ড পৃথিবী, ৫ম খণ্ড তাঁর নোট সঙ্কলন। মৃত্যু ৯০ বছরে, ৬ মে।

হুকার, যোশেফ ড্যালটন

(১৮৬৭-১৯১১)

জন্ম গ্লাসগো শহরে। পিতা উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপক ও উদ্যান নির্মাতা। গ্লাসগো থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক। ডারউইনের *Voyage of the Beagle* পড়ে চমৎকৃত ও প্রভাবিত হন। কর্মজীবন শুরুর আগেই ভ্রমণ ও সংগ্রহে যান অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফকল্যান্ড দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকাসহ বহু দেশে। এই সময় উদ্ভিদের ভূবিস্তারণ সম্পর্কে কৌতূহলী হন। লায়েল ও ডারউইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। ভ্রমণ শেষে কিছুদিন লন্ডনের কিউ উদ্যানে সৌখিন গবেষকের কাজ করেন। পিতা উইলিয়ম হুকার তখন ওই উদ্যানের অধ্যক্ষ। কিছুদিন এডিনবরায় উদ্ভিদবিদ্যায় শিক্ষকতা করেন। তাতে মন বসে না। ফিরে আসেন কিউ উদ্যানে। বৃটিশ ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থায়ও কিছুকাল কাজ করেন এবং প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যার প্রতি সাময়িক আকৃষ্ট হন। ১৮৪৭ সালে ভারতে উদ্ভিদ সংগ্রহে যান। ১৮৫১ সালে ফেরেন বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদ নমুনা ও ফসিল নিয়ে। এই অভিজ্ঞতারই ফসল *The Himalayan Journal* (১৮৫৪), উৎসর্গ করেন চার্ল্স্ ডারউইনকে। ১৮৫৫ সালে কিউ উদ্যানের সহকারী অধ্যক্ষ এবং পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬৫ সালে অধ্যক্ষ। তাঁর উল্লেখ্য কীর্তি জর্জ বেন্থামের সঙ্গে উদ্ভিদশ্রেণীবিন্যাসের একটি নতুন পদ্ধতি (Benthum-Hooker System) প্রবর্তন এবং সাত খণ্ডে রচিত *Flora of British India.* শেষোক্ত গ্রন্থটি আজও ভারত উপমহাদেশে এ-বিষয়ের প্রধান আকরগ্রন্থ। তাঁর লেখা মুখ্য গ্রন্থাবলি : *Flora Antartica* (১৮৪৪-৪৭), *Nizar Flora* (১৮৪৯), *The Rhododendrous of Sikim-Himalay* (১৮৪৯), *Flora Novi-Zilandi* (১৮৫৩-৫৫), *Himalayan Journal* (১৮৫৪), *Flora Tasmanian* (১৮৫৫-৬০), *Student's Flora of British I les* (১৮৭০), *Flora of British India,* ৭ খণ্ডে (১৮৭৫-৮৭), *The Handbook of Ceylon Flora* (১৮৯৮-১৯০০), *Life of Sir William Jackson Hooker* (১৯০২), *British Indian Species of Impalens* (১৯০৪-৬) ইত্যাদি। মৃত্যু লন্ডনে, ১০ ডিসেম্বর।

হেনস্লো, জন স্টিভেন্স্
(১৭৯৬-১৮৬১)
জন্ম ৬ মে ইংল্যান্ডের কেন্ট জেলায়। ক্যামব্রিজের সেন্ট জোন্স্ কলেজের স্নাতক (১৮১৮)। যাজকত্ব গ্রহণ (১৮২৪)। জীবতত্ত্বে আগ্রহ এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে আকরিকবিদ্যা (১৮২২) ও পরে উদ্ভিদবিদ্যার (১৮২৪) অধ্যাপক। উদ্ভিদবিদ্যায় সৃজনশীলতাসহ পাঠদান প্রবর্তন। সেজউইকের সঙ্গে Cambridge Philosophical Society প্রতিষ্ঠা (১৮২১)। ছাত্রদের সঙ্গে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতেন, ভূতত্ত্ব ও জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করতেন, কৃষকদের আধুনিক কৃষিবিদ্যা শেখাতেন। মৃত্যু ১৬ মে।
